

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক ভাব-ধারার বাহক সমরোপযোগী
বার্ষিক পত্রিকা

ত্রিবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ
সম্পাদিত

বিষয়

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
সাধনার পথে ... ১২৯	বীজ পরিচয় ... ১৫৬
হুটল-রূপথ—বড়দিনে বাঙ্গালী—সভাসমিতি	ত্রিযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ
—অর্থনৈতিক সম্মিলন—সাহিত্য সম্মিলন—	দশাবতার চরিত ... ১৫৭
মূল কোথায়—বারমাণী—বাক-শিল্প	ত্রিযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী
সাহিত্য ও অমৃত ... ১৩৭	সঙ্গীত ও বোণা ... ১৬১
পণ্ডিত ত্রিযুক্ত বিশিনবিহারি ঘটক	ত্রিযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ
কবীরের দৌহা ... ১৪২	দিগদর্শন ... ১৬৭
শিবপ্রসাদ	ত্রিযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ
অক্ষর-ব্রহ্মা ... ১৪৩	কাব্যতীর্থ
ত্রিযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু	যুক্তির চ'ক্ষে ভারতীয় অস্পৃশ্যতা ১৭৪
বন্ধিম-প্রতিভা ... ১৪৫	ত্রিযুক্ত প্রমথনাথ বসু, বি-এস-সি (লণ্ডন)
ত্রিযুক্ত বলাই দেব শর্মা	খোলা চিঠি—গান্ধীজীর প্রতি... ১৮০
হিমালয় ... ১৪৯	ত্রিযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ
ফ্রান্সিস ইয়ং হানব্যাণ্ড	আলোচনা ...
প্রশ্নোত্তরী ... ১৫০	সনাতন পন্থী বনাম সংস্কারবাদী
স্বামী মহাদেবানন্দ জি	আত্ম প্রভাবর্ণনা ... ১৮৫
সমাগতা (গল্প) ... ১৫২	একটা সভার নমুনা ... ১৮৯
ত্রিযুক্ত কেরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	মাস-পঞ্জি—পৌষ, ১৩৩৯ ... ১৯২

চতুর্থ বর্ষ

পৌষ—১৩৩৯

[৩য় সংখ্যা]

ভারতের সাধনা—সাধারণ নিয়ম

প্রতি বাঙ্গলা মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়—কার্তিক মাস হইতে বৎসর গণনা হইয়া থাকে; গ্রাহকগণ বৎসরের যে কোনও সময় হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইতে পারেন—মূল্য বার্ষিক ৪৮, ষাণ্মাসিক ২৪, প্রতিসংখ্যা ১০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র। মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে ডাক খরচ লাগে না। ১০ আনার ডাক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুনা স্বরূপ ১ সংখ্যা পাঠান হয়।

ভারতীয় সাধনার স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ—মানব জীবনের উৎকর্ষলাভে তাহার উপযোগিতা—এবং আর্থিক কল্যাণ, দেশের প্রকৃতি ও লোকের প্রয়োজনাদির লক্ষ্যে ইহার আবশ্যিকতা প্রভৃতি বিধা প্রবন্ধ, আলোচনা, মন্তব্যাদি সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

প্রবন্ধাদি-প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্র-ব্যবহার সম্পাদকের সহিত করিবেন; টাকাকড়ি, ও কার্য্যপরিচালন বিষয়ে চিঠি-পত্রাদি ম্যানেজার বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন।

দেশের ধর্ম্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাধনার নির্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে গৃহীত হয়।

কার্য্যালয়

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতের সাধনা

৮৪নং বেচুচাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভারতের সাধনার স্বকীর্তি প্রতিষ্ঠান

সুদর্শন যন্ত্রালয়

উৎকৃষ্ট ছাপার কার্যের জন্য এমন

বিশ্বাসযোগ্য স্থান দুর্লভ

মহঃশিল্পের কার্য্য ঠিক সময়ে ও উচিত মূল্যে ডাকমারফতে
করিয়া লইতে পারেন।

ম্যানেজার

সুদর্শন-যন্ত্রালয়

৮৪ নং বেচুচাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

চতুর্থ বর্ষ]

পৌষ—১৩৩৯

[৩য় সংখ্যা

সাধনার পথে

রাজনীতি আজ সকলের মনে প্রাধান্য লাভ করিয়া বাসিয়াছে। ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও জাতি রাজনীতির বলে আপন প্রভুত্ব খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, মনীষা ও প্রতিভাবান ব্যক্তিরাজনীতিতে আপন জীবনের কৃতকৃত্যতা চাহে, সর্বসাধারণ লোক আজ রাজনীতির পরাক্রমে আক্লান্ত, তার ভয়ে আরষ্ট ও চালে বিভ্রান্ত। সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরুঢ় কুটিল-কুপথ বিদ্যেদীপ্ত্যসম্পন্ন সমুজ্জ্বল রাজ-পরিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু জদল ও পর্কত বিচারী অসভ্য বর্বর পর্যন্ত আজ কাহারও রাজনীতির চক্ষু এড়াইবার যো নাই। বর্তমান জগতের যে উন্নতি সর্বমানবের পরস্পর গতগতি ও মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, তাহাতে লোকের ব্যক্তিগত, জ্ঞানগত, ধর্মগত, ধন-শিল্প-বাণিজ্যগত প্রাধান্য স্থাপনের স্পৃহাই বলবৎ; রাজনীতি তাহার পরিপোষণে নিযুক্ত। বর্তমান সভ্যতার প্রত্যয়ে রাজনীতির এই বিশেষ অভিব্যক্তি হইয়াছে, অথবা রাজনীতির এই প্রভাবে বর্তমান সভ্যতার এই বিকাশ হইতেছে।

রাজ-ধর্ম ও রাজ-নীতি এক কথা নহে। রাজধর্ম ক্ষত্র-বৃদ্ধির মহিমামণ্ডিত—দুর্কলকে রক্ষা করা মাত্র তার কার্য। তপশ্চা, যজ্ঞ, দান—ত্যাগ তার সাধন ও মূল মন্ত্র। ভারতের রামসেন তার আদর্শ। রাজধর্ম সরল, সুন্দর ও প্রকৃতির মহিমারঞ্জিত—ভারতের বর্ণাশ্রম তার অপূর্ব শৃঙ্খলা-মুদ্র;—সকল লোক যাহাতে সমভাবে নিজ নিজ শক্তি ও গুণের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে, এবং ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। রাজধর্ম তাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও তাহার নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত। সেবা-ধর্মের অমন বিরাক্রম আর কিছুতে প্রকাশ পায় নাই। ভারতীয় সাধনার তাবিক দৃষ্টি ছিল তার পরিচালন-মুদ্র।

রাজধর্ম যখন প্রভুত্ব পরিণত হইল, তখনই রাজনীতির ব্যভিচার প্রথম দেখা দেয়। কুটিলনীতি মন্ত্রি-পরিষদ তাহার সমর্থনে আসিয়া জুটিল; পবিত্র ক্রোধশ্রম শুরুর পরিণত হইল—বিজয় প্রতিষ্ঠা ও ধর্মেত্ব লাভের নামে আক্রমণ, পরপীড়ন, হত্যা ও ধ্বংস চলিতে লাগিল। কালক্রমে জন-মন তাহা সহ করিতে পারিল না; রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। রাজনৈতিক সভ্যতার এই যুগে রাজা-প্রজার সেই সংঘর্ষই জগতে চলিয়া আসিতেছে। রাজনীতি ও তাহাতে এক বিশিষ্ট রূপধারণ করিয়াছে—রাজশক্তি, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে, কেমন করিয়া অপর শক্তি-মানের বা আপন প্রজাশক্তির উপরে কৌশল বিস্তার করিয়া আধিপত্য বজায় রাখিবে, এবং অপর পক্ষে প্রজাপুঞ্জ কেমন করিয়া রাজার ক্ষমতা থর্ব করিবে—ইহার জ্ঞান যত প্রকার কুটিল নীতি হইতে পারে, তাহাই রাজনীতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে—এজ্ঞান বহু চাণক্য, মেকিয়াভেল ও বিস্মার্কের মস্তিষ্ক ব্যয় হইয়া গিয়াছে, আজও হইতেছে। ইহা পরিণামে এক এক দিকে সুসিদ্ধ হইতে দেখা গেলেও, সমগ্রের দৃষ্টিতে জগতে ঘোর অকল্যাণই আনয়ন করিতেছে। রাজনৈতিক চক্রান্তে কখনও কাহারও অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না। ব্যক্তিগত মনীষা, নৈতিক শক্তি ও তত্ত্বগত দিব্যদৃষ্টি রাজনীতিতে যতদূর অপব্যয়িত হইয়াছে, এমন আর কিছুতে নহে। স্বাভাব্য, সমানাধিকার, ধনসাম্য প্রভৃতি বাহ্য রাজনীতির চরম লক্ষ্য বলিয়া আজ সাব্যস্ত হইয়া আছে, রাজনীতির কুটিল পথে তার প্রকৃত সন্ধান কেহ কখনও পায় নাই—প্রভুত্ব ও পরপীড়ন কোনও না কোনও রূপে এখানে আরও বিকট রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতি মাত্র অগ্রশীল বলিয়া আজ বাহাদুরের অহুসরণ চলিয়াছে, তাহাদের অবস্থাই এরূপ। ভারত আজ রাজনীতির স্তরে খুব নিম্নে; আর অহু উহার যে অকল্যাণ ও কুফল, তাহা ভারতের উপর পূর্ণমাত্রায়ই পড়িয়াছে। প্রতিজ্ঞা রূপে ভারতের এক প্রকার রাজনৈতিক জাগৃতি জন্মিয়াছে, ইহাও দেখা যাইতেছে। কিন্তু কুটিল পথে চলিয়া ক্রমে তাহাকে যে আরও চক্রপাকে আবদ্ধ হইতে হইতেছে তাহা দেখাও করি নহে। ভারতের স্বকীয় স্বরাষ্ট্র-সাধনা আছে—তাহা সরল সহজ রাজধর্মেরই অমুখ্যায়ী—কুটিল রাজনীতির প্রতীক্ষা রাখে না। যুগে যুগে প্রবল প্রতিকূল শক্তির বাধা এড়াইয়া কুটিল পথ ছাড়িয়া যে আপন পথে চলিয়াছে, আজ পুনঃ তাহার ক্ষীণ উন্মেষ রাজনীতির জটিলতায় আবৃত দেখিয়াই যত আশঙ্কা হইতেছে।

বড়দিনে বাঙ্গালী।—

সমুদ্র ঐষ্ট জগতের প্রধান উৎসব খ্রীষ্ট-মাস-ডে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিউইয়ার্স-ডে বা পাশ্চাত্যের প্রচলিত বর্ষগণনার প্রথম দিনও সমাগত হইয়া নূতন বর্ষের সূচনা করিয়াছে। অল্পকার নানা বিভবে প্রভাবশীল, ভূমণ্ডলের সর্বত্র আধিপত্যকারী পাশ্চাত্যবাসীরা এই উভয়দিনকে পরম উল্লাস বা মহোৎসবের দিন বলিয়া গণনা করে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের প্রভাবাধীন স্থানের—প্রায় সমুদ্র পৃথিবীর—লোকেরাও ইহা না মানিয়া পারে না। বর্তমান এই বণিক-বৃত্তি-প্রধান কর্মবহুল লোকজীবনে সর্বত্র নববর্ষের এই দিন স্মরণে থাকে। খ্রীষ্টমাসদিবস জগতে যে মহাপুরুষের আবির্ভাবের ঘটনাকে সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাও বিলুপ্ত হইবার নহে। আজ উন্নত পাশ্চাত্যবাসীর সঙ্কীর্ণতাই ইহার গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অস্বাভাবিক অবনত দেশের জায় ভারতবাসীকেও ইহাদের মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু ইহার মধ্যেও বাঙ্গালী জাতি যে

মৌলিকতার ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছে, তাহা বাঙ্গালী মনীষা তথা ভারতীয় সাধনার এক বিশিষ্ট দিক্ দর্শাইয়া থাকে। খ্রীষ্টমাস ও নিউইয়ার্স দিবসের সুদীর্ঘ অবকাশ দিনগুলিকে বঙ্গবাসী এক নামে গ্রথিত করিয়া লইয়াছে—বড়দিন। বড়দিন উত্তরায়ণ-সংক্রমণের পরিসমাপ্তি ক্ষণ হইতে যে দিন দিন-মান বৃদ্ধি হইতে থাকে সে দিন—ভারতের সাধনা-দৃষ্টি কোনও লৌকিক ঘটনা বা বিষয়কে প্রাধান্য দিয়া চলিতে পারে না, ব্যষ্টির ক্ষুদ্রত্বে সন্তুষ্ট হয় না—পরমার্থের মহিমায় তার মর্ম্মার্থ অবধারণ করিয়া চলে—সমষ্টির বৃহত্ত্বের সংযোগে ক্ষুদ্রকে চিনিয়া লয়। এই সাধনার অন্তর্নিহিত প্রেরণা বশেই উত্তরায়ণ-সংবৃন্তির বর্দ্ধমান প্রথম দিবসে ভুলোক ও দ্যালোকের যে সংযোগ নির্দেশ হয়, তাহার মহিমায় ছায়া-তলে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী একালের দুঃখ বৈদেশিক ও বিজাতীয় নানা সংক্রমণের একটা প্রধান ধাক্কাকে প্রতিহত করিয়া, আত্ম-প্রতিষ্ঠার গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—বড়দিনে। বড়দিন বাঙ্গালী ভাষার বাদল! কথা। এ নাম খ্রীষ্টমাস ও নিউইয়ার্সের বিজাতীয়তাকে সত্যসত্যই ডুবাইয়া রাখিয়াছে।

সভা-সমিতিতে।—

বড়দিনের অবকাশে এদেশে নানা সভাসমিতির আয়োজন হয়। প্রধানতঃ জাতীয় মহা-সমিতি বা কংগ্রেসের অধিবেশন এই সময়ই হইয়া আসিতেছিল। রাজনীত্রে তাহা এই দুই বর্ষ স্থগিত আছে। এজন্ত বড়দিনের রাজনৈতিক এক প্রধান উৎসব হইতে এ দেশের লোক বঞ্চিত রহিয়াছে। কারাগ্রাচীরের অন্তরালে কংগ্রেস কর্ম্মীগণ কিরূপ উৎসব সাধন করিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই; বাহিরে হৃদয়ের অন্তরে দেশের লোক সেরূপ কোনও উৎসব করিয়াই কিনা, তাহাই বিচারের বিষয়। তবুও কয়েকটা সভা নানা স্থানে হইয়া গিয়াছে। রাজনীতির ব্যাবর্তনে ইয়ারবেদা জ্বলে মহাত্মা গান্ধীকে কেন্দ্র করিয়া অস্থায়ীতা ও দেবমন্দির প্রবেশ লইয়া যে পণ্ডিত সভা হইয়াছে, এবং এলাহাবাদে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যয়ের প্রচেষ্টায় ভাবী শাসন-সংস্কারে ব্রিটিশ মহামন্ত্রীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মিশ্র নির্বাচন প্রবর্তনের জন্ত এদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যে সম্মিলন হইতেছে, তাহাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুই সম্মিলনই একেবারে সন্ধান করিতেছে। একটা হিন্দু সমাজের উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মধ্যে এক্য স্থাপন করিতে চাহে—অপর হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ প্রভৃতি নানা রাজনৈতিক দলের মধ্যে মিলন কামনা করে। দুই সম্মিলনেরই ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—একোয় স্থানে অনৈক্যের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবলমাত্র এই সম্মিলনীতে নহে; এ যাবত যত এক্যবিধান, 'প্যাঙ্কি', 'চুক্তি' আদি হইয়াছে, তাহার ফল এইরূপই হইয়াছে। আজ আবার ইহার কারণ অনুসন্ধানের সময় আসিয়াছে। সমুদয় অনৈক্যের মূলে রহিয়াছে আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের পূর্ণ কামনা। এ সকল সভাসমিতিতে অনেক সময়ই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগের মতন দুঃপ্রবৃত্তির উত্তেজনা বৃদ্ধি হয় মাত্র। পক্ষ-পক্ষের ভাব আরও প্রবল আকার ধারণ করে। তবুও ইহার সমাধানের উপায় আছে। রাজনৈতিক ব্যাপারে এক্য আনিতে হইলে, সমুদয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য দেশপ্রীতি ও দেশের কল্যাণকেই লোকের মনে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। এজন্ত যে শিক্ষা দীক্ষা ও লোকমত সর্জন প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে; সময়সাপেক্ষ হইলেও ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট লৌকিক উপায়; অতথা বিরোধ ও অনৈক্য বাড়িয়াই চলিবে এবং তাহাতে এমন অনিষ্টপাত ও বিষমঞ্চ হইতে থাকিবে, যে তাহাতে

অনৈক্যকারীর দল আপনাই বিনাশ পাইবে—সে ধ্বংস ও বিনাশের পথেই অজ্ঞ সকলে চলিয়াছে। আর যদি ভারতের দেবতা রূপাপরবশ হইয়া ইহার মধ্যে আসিয়া উদ্ধার সাধন করেন, তবে এক উপায় আছে। হিন্দুর সমাজে ও ধর্মব্যাপারে যে অনৈক্যের বুদ্ধি হইয়া আসিতেছে তাহাতেও ঐ রূপই স্বার্থ ও ঐক্যের খেলা চলিতেছে মাত্র। যদি সমাজের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকে,—সমাজের কল্যাণই সকলের কামনা হয়, দেবতায় বিশ্বাস থাকে, তবে সেই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের জোরেই সমুদয় অনৈক্যের সমাধান হয়; ইহাদের অভাবেই না আজ এত অনৈক্য ও অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে—সমাজ ও দেবস্থান উভয়ই ধ্বংসের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে; এ অনৈক্য হয়ত সেই ধ্বংসের লীলাই পূর্ণ করিবে। যদি কোনও মহাপুরুষ আসিয়া প্রকৃত ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস মূলে ইহার উদ্ধার সাধন করিয়া যান, তবে এক পথ আছে।

সাহিত্যসম্মিলন—

সাহিত্য সম্মিলন নামে দুইটি সভা বাদলা-সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া হইয়া গিয়াছে। একটি প্রয়াগে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন, অপরটি কলিকাতার মুসলমান-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন। সাহিত্যই সম্মিলনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। জাতীয়-সাধনার পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় সাহিত্যে। এই সাহিত্য বাদলার যে সম্পদ এমন আর কিছুই নহে। প্রবাসী বাঙ্গালী তাহা ভুলিয়া থাকিতে পারেন নাই; তাই বর্ষে বর্ষে তাহার বাঙ্গলার বাহিরে কোন না কোন স্থানে সাহিত্যের নামে সম্মিলিত হইয়া মাতৃভূমির সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন। যে প্রবাসী বাঙ্গালী জীবনে বাঙ্গলার মাটি সন্দর্শন করে সেই সেও পুলকে এই সম্মিলনীতে একত্র হয়। অতীতকে বঙ্গীয় মুসলীম আর সকল প্রকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিলেও বঙ্গ-সাহিত্যের মমতা ভুলিতে পারে নাই। সাহিত্যও জাতির একটা বিশিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্যের নির্দেশ করে। নব্য মুসলীমের এই সাহিত্য-প্ৰীতির সম্যক বিকাশ সাধন হইলে, সত্য সত্যই বাদলার অনেক দুঃখ প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়। তখন সাহিত্যের সম্মিলন-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান এই পার্থক্য মুছিয়া যাইবে—সাহিত্য যে জাতীয় সাধনার বাহক তাহাই সকলের হৃদয়ে স্পষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। এ জন্ত চাই সাহিত্যের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা ও তাহার বিশিষ্ট রূপের অর্চনা। বাদলা-সাহিত্য যে আকারে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল একালে তাহাতে নানা অনাচার ও বিদ্বেষের ভাব দেখা দিয়াছে বলিয়াই এ আশঙ্কার কথা বলিলাম।

অর্থ-নৈতিক সম্মেলন।—

অর্থ নৈতিক-সঙ্কট আজ সকল দেশেই বিদ্যমান। শক্তিমান দেশ সমূহ নিজ নিজ সমস্যার সমাধান নিমিত্ত যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছে; এবং মানুষ্যের ইহাতে যতখানি হাত আছে, ইহার তাহা করিবে। শক্তির লক্ষণ এই যে, উহা বাস্তব বা প্রকৃত বিষয়কে ধরিয়া নাড়াচাড়া করে, আর দুর্বলেরা ভাব বা কল্পনা মাত্র লইয়া চলে। বর্তমান ভারত দৈন্য ও দৌর্ভাগ্যের প্রতিকৃতি। কাজেই অতি বড় কঠিন সমস্যারও সমাধান হয় এইখানে ভাবে—অহিন সভায় বিতর্কে বা পণ্ডিত সভার আলোচনায়। সে জন্ত এই কঠিন অর্থ-সমস্যার দিনে রাজধানী দিল্লী নগরীতে অর্থনীতি বিষয়ক পণ্ডিতসম্মিলন বা ইকনমিক কন্ফারেন্স হইতে দেশের লোকেও আশা কিছু করে নাই, কার্যতঃও

তেমন কিছু হয় নাই। অনেক বিখ্যাত লোকের বহু অর্থনীতি-বিশারদ অধ্যাপকই তাহাতে উপস্থিত ছিলেন—সরকার পক্ষে অর্থনীতিজ্ঞগণও তাহাতে ভাগ হইয়াছিলেন। পণ্ডিতদিগের বিচারের দ্বারা যে সমাধান হয়, তাহা লোকচার রূমের গন্ধ ছাড়া হয় না, প্রকৃত বিষয়ের পরিচয় তাহাদের দ্বারা পাওয়া যায় না! আর রাজপুরুষেরা যে চক্ষে ইহা দেখেন, তাহা অতিমাত্র স্বার্থদৃষ্টি-দৃষ্ট না হইয়া যায় না—সরকারের হাতে আইন কাছনের অস্ত্র রহিয়াছে, সংস্কার শাস্তির দণ্ডও আছে—তাহা বাহাল রাখিয়া যদি সম্মিলনের নিষ্ঠা চলে তাহাতে শাসনের তির কোনও ব্যত্যয় ঘটে না, আর বিশ্ব-পণ্ডিতগণের প্রধান সম্বল বৈদেশিকের লিখিত পুস্তক ও তাহাদের নানা থিয়রী। কাজেই স্থিরীকৃত হইল—The different factors that have made the problem difficult are (1) To find a profitable market for the raw products and (2) to strike a healthy balance between agriculture and industry. দেশের কাঁচা মালের জন্ত তেমন বাজার পাওয়া যাইতেছে না আর কৃষি ও শিল্পে সামঞ্জস্য করা দায়—ইহাই কঠিন কথা; তাতেও নাহি আরও জটিলতা বাড়িয়াছে সরকারের exchange policy বা বিনিময়-নীতির দ্বারা। যাহার এ সমল তত্ত্বের সংবাদ রাখে না, ভারতের সেই কোটি কোটি নরনারীর পেটের আগুন কি এই সকল তত্ত্বের আলোচনাতে নিবিতেছে?

মূল কোথায়?—

সরকারী রটনাবিভাগের প্রচারিত একখানি পুস্তকে—‘আইনভঙ্গ ও অনাচার’—লিখিত হইয়াছে, “এই যে ভদ্রশ্রেণীর যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবার পর ডাকাতীর সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইতেছে, ইত্যায় প্রবৃত্ত হইতেছে, আর এই যে যুবতীরাও শিক্ষা লাভের পর এই সব হীন কাজে যাইতেছে, ইহার মূল কোথায়?” বিভাগের বিবেচনায় এই সকল ‘অনাচার’ ‘আইনভঙ্গ’ আন্দোলন হইতেই মূলতঃ উদ্ভূত। “আইন অমান্ত্রের প্রবৃত্তি উত্তেজিত করায়, দেশে বিশৃঙ্খলার ভাব বাড়িয়া উঠে ও ক্রমে তাহা অনাচারে পরিণত হয়।” প্রশ্নের মূলতঃ সমাধান এখানেই হইল না। উত্তেজনা নহে অসন্তোষই মূল কারণ;—উত্তেজনা সাময়িক কারণ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে সত্য, কিন্তু মূলতঃ ইহার উদ্বেক হইয়াছে চিন্তের কোনও নিদারুণ অসন্তোষ হইতে। বিবিধ কারণেই অবশ্য এই অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে—দেশের দুরবস্থা, স্বাধীনতার স্পৃহা, জীবনে নিরাশা—আর্থিক সংকট, এদেশের শিক্ষিতের পক্ষে কোনরূপ সম্মানজনক কর্মপথ মুক্ত না থাকা এবং সরকারের সমূহ নিপীড়ন-নীতির প্রতিক্রিয়া। নিরপেক্ষ ভাবে রটনার কার্য পরিচালনা কঠিন সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা যখন প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যে স্থান অধিকার করিবে, তখন সাবহিত হওয়াই কর্তব্য। নতুবা পক্ষাপক্ষদোষপ্রযুক্ত এ সকল লেখা মণী-লিখিত সুসমাচারের মত আদর পাইবে মাত্র।

বারমাসী।—

ইংরেজী ১৯৩২ সনের আর্ভনচক্র পূর্ণ হইয়া গেল। কোথায় কত ঘটনা! তাহাদের নীরব বাণী লইয়া এই বিশাল সময়স্রোতে তরঙ্গের মত উঠিয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে, কেহ তার সন্ধান

রাখে না ; হয়ত ইহাদেরই কাহারও নিবিড় স্পন্দনরেখা ভাবী আর কোনও উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করিবে। অত্য়কার মানব রাজনীতি লইয়াই ব্যস্ত,—যাহার সব খানি উত্থান পতনেই বিলয় হয়। ইহার কাছে এ বৎসরের বারমাসীও রাজনীতিতে পর্য্যবসিত। পতিত ভারতে এবার রাজনীতির প্রচণ্ড আঘাত ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে পড়িয়াছে। সমুদয় পৃথিবীর পক্ষেও নাকি এ বৎসরটা কেবল সভা-সমিতির বৎসর—লুসেন, জেনেভা আর অটোয়া ; ইহার মধ্যে প্রথমেই বলসেভিক রুশ আপন পরিকল্পনাতে পাঁচ বৎসরের জ্ঞাত নিশ্চিত হইয়া লইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের দুরন্ত বোঝা ঘাড় হইতে নামাইবার জ্ঞানই নাকি লুসেনের আয়োজন ; সঙ্গে সঙ্গে একদিকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রীকরণের কথাও উঠিয়াছে, আবার অস্ত্র পক্ষে ভারতের অস্ত্রবিহীন দলপতি ও তাহার সহস্র অহুচরগণের জীবন্ত সমাধি ঘটে, আর অস্ত্রশস্ত্রে স্তম্ভিত জাপান চীনের উপরে নূতন ধাওয়া করে—ইংরেজ ও আমেরিকার শান্তির জ্ঞাত অমরোদ রক্ষা করে নাই। তার পরই জার্মেনীতে নাজিদলের অভ্যুদয় দেখা দেয়, আর আয়ারলণ্ডে ডি. ভেলেরা সিনেট সভাতে ঘোষণা করেন যে, যুক্ত আয়ারলণ্ড আর ব্রিটিশ রাষ্ট্রযুক্তির প্রতি ভক্তিসূচক শপথ করি। যুক্ত থাকিতে চাহেন না। ইংলণ্ডের উদার নৈতিক রাজনৈতিকেরা বহুকাল স্থপ্ত থাকার পর এই সময় হইতে পুনঃ রাজনীতির দলক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থ সংকট এই সময় সর্বত্র প্রবল রূপ দেখা দেয়, স্বপ্রসিক্ত সুইটিস্ ধনকুরের আইভেন জুগারের আত্মহত্যা ব্যাপারে ইহার মাত্রা বুঝা যায়। এপ্রিলের বজেট বা আয়-ব্যয়-হিসাবেও সর্বত্র তাহা পরিলক্ষিত হয়। মে মাসে সাংসুইয়ে চীন জাপান সমরানল নির্ধারিত হইয়া সাময়িক এক সন্ধি হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসীর বৃদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক ক্লোঁ পল ডুমার এক রুশ গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। বৎসরের মধ্য ভাগে লুসেনের উপসংহার হয়, আটোমোটি সন্ধিতগুলি "Gentlemen's Agreement" বা ভদ্র লোকের চুক্তি বলিয়া গণ্য হয়, তাহা সকল দেশে মানিয়া না লইলে কাজে খাটান হইবে না এবং জার্মেনীর উত্তমর্গণ তাহাদের প্রাপ্য-প্রাপ্তিতে সন্তোষ লাভ না করিলে উহা কাজে আসিবে না, ইহাও ধার্য্য হয়। লুসেনের কার্য্য তাড়াতাড়ি সমাধা করিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীপক্ষ অটোয়া কনফারেন্সের জ্ঞাত প্রস্তুত হন। জুলাইর শেষ ভাগে রাজার গুডহোবার্গিসহ বনফারেন্সের কার্য্য আরম্ভ হয়। এদিকে আইরো-এংগো বিবাদ আরও পাকিয়া উঠিয়াছে—ইংলণ্ড কতকগুলি আইরিশ মালের উপরে শতকরা ২০ হিসাবে বাণিজ্য কর বসায় বলিয়া ডি. ভেলেরা আর একটা কার্য্যক্রম দেখান—ব্রিটিশ মালের উপরে এক আইরিশ ট্যাক্স বনাইয়া। সঙ্গে সঙ্গে জার্মেনীতে সমাজ-সাম্য-বাদীদিগের প্রভাব বৃদ্ধি পায় ; শাসকগণ কঠোরনীতি অবলম্বন করেন ; সাময়িক শক্তির সাহায্যে নাজি ও সমাজসাম্যবাদীদিগের দলন আরম্ভ হয়—তথাপি নাজিদলের ভোটাধিক্য লাভ হয় এবং রাষ্ট্র-গোলযোগ চলিতে থাকে, নদেই প্রেসিডেন্ট হত্যারের অস্ত্র-সম্বরণ-পরিকল্পনা জেনেভা ও ওয়াশিংটনে প্রচারিত হয়, ইটালী উহার বিশেষ সমর্থনও করে, গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সে আংশিক সমর্থন দেখা যায়।

আগষ্টের শেষে অটোয়া কনফারেন্স সমাপ্ত হয়, বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ সাফরযুক্ত চুক্তি করিয়া আসিয়াছেন। কনফারেন্সের পরিণতি প্রারম্ভের তুলনায় আশাশ্রয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই—ইংলণ্ডের উদারনীতিকেরা ইহার কঠোর সমালোচনা করেন, অপরে নাশায় পানিয়া লইয়াছেন, তাহাদের রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বলিয়া ; সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকার

পৌষ—১৩৩৯]

সাধনার পথে

যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের একটি “পররাষ্ট্র-সম্বন্ধ-চুক্তি-সম্মত” করিয়া বসিয়াছেন, তার এক বিশেষ অবিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অটোয়ার উত্তর মিলে।

বৎসরের শেষ ভাগে জার্মেনী অস্ত্রাশ্রয় শক্তি সমূহের সহিত তুলা রাষ্ট্রপদবী—“equality of status”—দাবী করিয়া বসেন, নিরস্ত্রীকরণ-সমিতির কার্যে দোষ দেখাইয়া ইহার বলিয়াছেন যে, ভাসেলিসের মূল সন্ধি চুক্তিতে যে প্রতিশ্রুতি ছিল এ সমিতি তাহাও পূর্ণ করিতে যায় নাই। ফল ফরাসী ও জার্মানদিগের মধ্যে মন কষাকষি বৃদ্ধি পাইয়াছে—ব্রিটিশের মনোভাব অস্পষ্ট; নিরস্ত্রীকরণ উদ্দেশ্যে যে নূতন জাতিবাহ স্থাপিত হইয়াছে (Bureau of Disarmament conference) তাহাতে জার্মান ডেলিগেটেরা প্রবেশ করেন নাই। ভারত রাষ্ট্র-সংস্কার সম্বন্ধীয় গোলটেবিলের তৃতীয় অভিনয় এই সময়েই হইয়া গিয়াছে; স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী ইহার ভার নিয়াছিলেন; উহাতে উচ্চ বাচ্য বড় কিছু এবার শুনা যায় নাই—কেবল জানা গিয়াছে ইংলণ্ডের সাধারণ মনোযোগ এ সময় অটোয়া, জেনেভা ও আয়ারল্যান্ডের দিকে এত অধিক ছিল যে, ভারতের দিকে নজর দিবার সময় বড় কাহারও ছিল না; আর প্রতিপক্ষ ভারতীয় কংগ্রেসের দল ইতিমধ্যে নির্ধাতিত বা নিষ্পেষিত হইয়া রহিয়াছিল। মহামন্ত্রী প্রধানতঃ ভারতীয় সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের বিশিষ্ট ভোটাধিকারের সহিত হিন্দুদিগের উন্নত ও অল্পমতের মধ্যেও ভোট-পার্থক্যের বিভেদ রাখিয়া দেন—কারাগার বন্ধ ভারতের মহাত্মা গান্ধী ইহার বিকল্পে মৃত্যুপণ অনশন ব্রত গ্রহণ করিতে বিভিন্ন হিন্দু নেতারা একত্র হইয়া এক প্রকার যুক্ত-ভোটের ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছেন ও রাজমন্ত্রী তাহা স্বীকার করিতে, মহাত্মা অনাহার ব্রত ত্যাগ করেন।

চীন সম্পর্কে জাপানের উপক্রমকেই এ বর্ষের প্রধান ঘটনা বলিতে হইবে। সাংহাইর সাময়িক শান্তি-চুক্তির পর জাপান একটি অপূর্ণ খেলা খেলিয়াছে—সেপ্টেম্বর ১৫ই তারিখে মাকুরিয়াতে আপন প্রভাব সম্বন্ধিত করিয়া নিমিত্ত জাপান আপন হস্তের পুতুল স্বরূপ প্রাচীন মাকুরাজ-বংশের এক বালককে রাজা করিয়া এক নূতন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এবং তাহার সহিত নিজ স্বার্থ ও অধিকার অক্ষুর রাখিবার কল্পে একটি সন্ধি করিয়াছে। ইহাতে সমুদয় রাজনৈতিক বায়ুমণ্ডলে এক আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। জেনেভার জাতি-সম্মত চীন জাপান বিবাদের অল্পসন্ধান ও তাহাতে মতামত প্রকাশ জন্ত লিটন কমিশন নামে একটি অল্পসন্ধান সমিতি প্রেরণ করেন। কতকগুলি সাধু ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এই কমিশন তাহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন—বাহার সম্বন্ধে মতভেদ সর্বত্র দেখা দিয়াছে। অল্পদিকে জার্মানদিগের পক্ষে নিরস্ত্রীকরণ সভাতে যোগদান না করিতে শক্তি-সম্ভবের আর এক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রিটিশ মহামন্ত্রী প্রস্তাব করিয়াছেন জার্মেনীর পদবীসাম্য লইয়া লওনে চতুর্শক্তির একটি কনফারেন্স হইবে; ইতালীয় মুসোলিনি ও ফরাসী রাজমন্ত্রীগণ ইহাতে নিজ নিজ স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিষয়টি এ বর্ষের জন্ত অগীর্ষ্যমিতই থাকিয়া যাইবে। অইল্যান্ডের ডি. ভেলেরা লওনে আসেন, কিন্তু তাহার সহিত বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা কিছু হয় নাই। অক্টোবরের শেষে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সভা তাহা মাকুরিয়া লইয়াছে। নভেম্বরে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটে—গণতান্ত্রিক নেতা গভর্নর রুগভেন্ট প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়ক হবার স্থান অধিকার করেন। এই নূতন

রাষ্ট্রনায়ক ইউরোপীয় শক্তিগুঞ্জের সমরঞ্জন রেংই দিতে একান্তই অসম্মত—বরং তাহা ডিসেম্বরের ১৫ তারিখে চুক্তি মত আদায় করিতে বন্ধপরিষ্কর। এ জন্য ব্রিটিশ জাতির মধ্যে ঘোর চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। অবশেষে তাহা দেওয়াই স্থির হইয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে জাপান পুনঃ চীন ও মাঞ্চু সীমানায় যুদ্ধোচ্চোগ আরম্ভ করিয়াছে—ইহাতে ভীষণ আর এক জগদব্যাপী সমরের আশঙ্কা করা যায়; আগামী বর্ষ ইহার ফলাফল দেখিবে।

ভারতে এক সামাজিক বিপ্লব রাজনীতির হুত্র ধরিয়া হিন্দুসমাজের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এই বর্ষের প্রধানতম ঘটনা বলা যাইতে পারে। কারণ যে সকল ঘটনা অন্যত্র ঘটিয়াছে, তাহার মূল উচ্ছেদ বা স্থাপন করা কোনও কঠিন বা গুরুতর বিষয় নহে। মানব সমাজের কোনও গৃহনীতি বা জগত্ত্বের কোনও চরম সত্যের সহিত উহাদের নিবিড় সম্বন্ধ কিছুই নাই। উহার উঠিতেছে, পড়িতেছে—নিত্য পরিবর্তনের বিষয়। পক্ষান্তরে ভারতীয় সমাজের ভিত্তি ভারতের অসাধারণ সাধনালব্ধ পরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের ধর্ম ব্যবহারিক পরীক্ষা মূলক, সর্বসাধারণের পক্ষে অমোঘ ফলপ্রসূ। আজ তাহা লোকের জীবন পথের বহির্ভূত, ধারণার অতীত; তবুও নানা সমাজ-ব্যবস্থার গুণে লোকে পরোক্ষে তাহার অনুসরণ করিতেছিল; এবং সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া হিন্দুর সমাজ তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। মানবের ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় আর কিছুই নাই। এক্ষণে এই সমাজের উপর যে বিপ্লবের ঢেউ আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাতে হয় এ সমাজ ও হিন্দুজাতি বিলয়ের পথে ভাসিয়া যাইবে, নচেৎ হয় ত ইহার ঘাত প্রতিঘতেই বর্তমান হিন্দু ধর্মেরই আরও ভাব ঘুচিয়া গিয়া জগতের ইতিহাসে ভারতের মহিমা পুনঃ ঘোষিত করিবে।

বাক-শিল্প।—

বাক্যের চটুলতা চির কালই মনোহারিণী; তার সঙ্গে ভাব-বিশ্বাস উত্তম থাকিলে ত কথাই নাই। সাহিত্যে ইহার আদর অত্যধিক। বর্তমান সময়ের বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক বার্নাড-শ সেদিন বোম্বাই উপকূলে কয়েকটি খণ্ড-বাক্যে যে রস-নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন, আজ ভারতের সহিত ইংরেজের যে সম্বন্ধ তাহাতে দুর্ভাগ্যক্রমেই সেরূপ কথা কোনও ইংরেজের মুখে শুনা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সম্বন্ধ লইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সময় আসিতে পারে যখন ভারত হইতে স্বাভাবিক লাভের জন্য ব্রিটিশ দিগেরই প্রাণ-পণ সংগ্রাম করিতে হইবে—“It is quite possible that in future if Indian institutions are developed and population become educated, England would make a desperate struggle to be separated...” আধুনিক সভ্যতার প্রকৃতি কিঞ্চিৎ নির্দেশ করিয়াছেন এই বলিয়া—“আজ যদি গান্ধী ৬০ হাজার লোকের হত্যা সাধন করিতে পারিত তবে তাহার কথা সকলেই শুনিত।” ভারতের অস্পৃশ্যতার প্রসঙ্গে বলেন—“ইংলণ্ডের কোনও শ্রমিকের ছায়া স্পর্শে হয়ত কোনও আভিজাত্য-সম্পন্ন রমণী শিহরিয়া উঠিবেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু সে শ্রমজীবী যদি তাহার কন্ঠার পাণি গ্রহণ করে, তবে সে অস্পৃশ্য হইয়াই থাকে।” ভারতে প্রবেশ করিয়া তাহার সাধারণ অবস্থা দেখিবার কোতুল তাহার নাই, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন—কারণ তাহার ভাবগর্ভ ভাষায় “ভারতে এখন তিনি রেলগাড়ীর একটা কামরা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না।” এই একটি বাক্যেই কবি এক থানি বিরাট নাট্যের ছবি হয়ত দেখিয়াছেন।

সাহিত্য ও অমৃত

[পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘটক]

(পূর্বাহ্নরুতি)

দিব্ ধাতু অল প্রত্যয় করিয়া “দেব” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; “দিব” ধাতুর অর্থ ক্রীড়া (“দিবঃ ক্রীড়াম্য”) ; ক্রীড়া বিদ্যুতের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম ; দেবতার তদান্বক সাহসিক-আকার-বিশিষ্ট চেতনাময় বিশেষ ব্যক্তি । সৃষ্টিরাজ্যের দৈনন্দিন বৈচিত্র্য রক্ষাই দেবতার নিত্য কর্ম ; এ মহৎ কর্মের অন্তঃশ্রোত, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরীণ স্তরে স্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর গুপ্ত প্রবাহের ন্যায় দিনযামিনী অবিশ্রান্ত এক তানে নীরবে প্রবাহিত হইতেছে ! উহার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে জগতের সৃষ্টি,—স্থায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে স্থিতি এবং অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জগতের বিনাশ অনিবার্য । এ নিগূঢ় রহস্য প্রজ্ঞান-বোধ্য ; বিজ্ঞান উহার সহস্র যোজন অন্তরালে থাকিয়া এক আধটুকু নাম মাত্র আহরণ পূর্বক তত্ত্ব-রাজ্যের গৈশব-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া ভোগবিলাসিতাচ্ছন্ন মানব জগৎ স্তম্ভিত করিতেছে ।

দেবগণের কর্মের সাধারণ বৈদিক নাম ‘যজ্ঞ’ ; বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক আরণ্যক ; মহাযিগণের মতে সেই মহাযজ্ঞ বা মহৎকর্ম প্রধানতঃ পঞ্চাধিভুক্ত ; যথা,—

১। পাক্ষালরাজ জৈবলি বলিলেন—“হে গৌতম ! এই প্রসিদ্ধ দ্রালোককে যজ্ঞীয় অগ্নি স্বরূপ মনে কর, আদিত্য তাহার সমিৎ (সমীপীয় বস্তু), রাশ্মি ধূম, অহঃ অর্চ্চিঃ (মহাগিব শিখা), পূর্ব-পশ্চিমা দিক্ সকল অঙ্গার, অগ্নি-নৈঋতাদি কোণ সকল বিশ্বলিঙ্গ (যজ্ঞাগ্নির ফোয়ারা), এতাদৃশ গুণ-সম্পন্ন দ্রালোকায়িতে ইন্দ্রাদি দেবগণ শ্রদ্ধাকে হোম করেন ; সেই আহুতি হইতে ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের অধিপতি চন্দ্রের উৎপত্তি ।

২। হে গৌতম ! পঞ্চমুককে যজ্ঞীয় অগ্নি স্বরূপ মনে কর, সম্বৎসরই তাহার সমিৎ, মেঘমালা ধূম, বিদ্যুৎ অর্চ্চিঃ, অশনি অঙ্গার, বৃষ্টি ফুলিঙ্গ, এতাদৃশ গুণ-বিশিষ্ট পঞ্চমুকায়িতে দেবগণ ব্রাহ্মণগণ ও পিতৃগণের অধিপতি চন্দ্রকে হোম করেন, সেই আহুতি হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি ।

৩। হে গৌতম ! এই প্রসিদ্ধ ভুলোককে যজ্ঞীয় অগ্নি-স্বরূপ মনে কর, পৃথিবীই তাহার সমিৎ, অগ্নি, ধূম, রাত্রি, শিখা, চন্দ্র অঙ্গার, নক্ষত্র সকল ফুলিঙ্গ, এতাদৃশ গুণ-বিশিষ্ট ভুলোকায়িতে দেবগণ বৃষ্টিকে হোম করেন, সেই আহুতি হইতে অন্নের উৎপত্তি ।

৪। হে গৌতম ! পুরুষকে অগ্নি স্বরূপ মনে কর, তাহার সমিৎ প্রাণ ধূম, বাণ্ শিখা, চক্ষু অঙ্গার, শ্রোত্র ফুলিঙ্গ ; এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট পুরুষায়িতে দেবগণ অন্ন হোম করেন ; সেই আহুতি হইতে রেতের উৎপত্তি ।

৫। হে গৌতম ! যোষিতকে অগ্নি স্বরূপ মনে কর, উপস্থই তাহার সমিৎ, লোমাবলী ধূম, যোনি শিখা, অন্তঃকার্য্য অঙ্গার, প্রীতি ফুলিঙ্গ, এতাদৃশ গুণ-বিশিষ্ট যোষিতায়িতে দেবগণ রেত হোম করেন, সেই আহুতি হইতে পুরুষের উৎপত্তি । মরণ পর্য্যন্তই তাহার স্থায়িত্ব ।

উক্ত দেবাত্মিত পঞ্চমহাযজ্ঞের বিশ্বজনীন স্বগভীর রূপক বর্ণনার প্রকৃত মর্মার্থ অবধারণ করা অসাধারণ আর্ঘ্যপ্রতিভার কর্ম ; সাধারণ ব্যবসায়াত্মিকা ক্ষুদ্র বুদ্ধি উহার ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। উহার একটি অক্ষর প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়ীভূত ; তদর্থে সাময়িক বিজ্ঞানচাৰ্য্য জগদীশ-প্রমুখ লোকবিশ্রুত সুধীগণের মনঃসংযোগ বাঞ্ছনীয়।

দেবযজ্ঞ অর্থাৎ দেবতার কর্ম স্বভাবতই সাধারণ মানুষের দুর্কোধ্য ; অসাধারণ মেধাবী প্রজ্ঞা-চক্ষু আরণ্যক ঋষিগণই তাহার রহস্য সম্যক্ অলুভব করিয়া মানব-জগতের প্রস্ফুরিত অবস্থায় যজ্ঞের অনন্তসাধারণ ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা একদা ধরণীতল ধৃত করিয়াছিলেন ! ক্রমশঃ আর্ঘ্যভাবের শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুমহান্ ঋষি-যজ্ঞ, অধুনা নাম মাত্রাবশিষ্ট সাধারণ “কুশণ্ডিকায়” অপনত হইয়া উহার গুরুত্ব এতই লঘুকৃত করিয়া ফেলিয়াছে যে তদ্বারা যজ্ঞের মহত্ত্ব কণামাত্রও প্রকটিত হইতে পারে না, বরং অধিকাংশ স্থলেই বেদ-বিশ্রুত যজ্ঞ-কার্য্য পদে পদে যজ্ঞমানের অবজ্ঞার বিষয়ীভূত হইয়া, জগৎপূজ্য আৰ্য্য জাতি ও আৰ্য্য সমাজের দারুণ অধঃপাত সূচনা করিতেছে !! এ সময় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের গভীর গবেষণা ভিন্ন ঋষিবাক্যের মর্মোদ্ঘাটন করার উপায়ান্তর দৃষ্ট হয় না ; যেতক বৈজ্ঞানিক সুধীরন্দ তদ্বিষয়ে অভিনিবিষ্ট না হইবেন, সে পর্য্যন্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রও, তত্ত্ব-বিচার রাজসিক ও তামসিক ভাব অতিক্রম করিয়া দিব্যভাব সাত্ত্বিকতায় পৌছিতে পারিবে না। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক রজস্তমোভাবে মানব জগৎ অন্তর্ভাবে একান্তই ভারাক্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ; এ সময় সাত্ত্বিকতার অলুপ্তলন ও অলুপ্তরণ না করিলে উহার পরিণাম যে অনতিবিলম্বেই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত দেব-যজ্ঞেই সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশ-ধর্মী জগদ্ব্যবস্থার অচিন্তনীয় ক্রিয়া-কলাপ অবিরাম অব্যাহত চলিতেছে। সেই সনাতন অন্তঃপ্রবাহী অমোঘ নিয়মে সীমাবদ্ধ হইয়া চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি যথাকালে যথা নিয়মে নভোমণ্ডলে উদিত ও অস্তমিত হইতেছে ; ঐ শাস্ত্র নিয়মের অত্যাশ্চর্য্য মহিমা বলেই তরু-শুভ্র-লতাবলী ভূগর্ভস্থ অমৃতময় রসাকর্ষণে হস্তপুষ্ট ও বর্ধিত হইয়া অশেষ প্রকারে ভূতধাত্রী বসুন্ধরার সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছে ; জায়মান জীবগণ প্রত্যক্ষে সর্ব প্রকারে স্বতন্ত্র হইলেও অভ্যন্তরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিবৃতি-সম্বলিত রমণীয় পিণ্ডদেহে বিরাজিত হইয়া জলে-স্থলে ভূগর্ভে-আকাশে নিরন্তর অত্যদ্ভুত মহতী লীলা বিস্তার করিতেছে ; ঐ অমোঘ প্রবাহের অল্পবর্তী হইয়াই বসন্ত ঋতুর মলয়ানিলবিধূত স্পৃহণীয় নবলাবণ্য, নিদাঘের অবিবাহ জালা-মালা, বর্ষার ভূরিবর্ষণবাহুলা, শরতের শুভ চন্দ্রালোক-চূষিত রজনীর রমণীয়তা, হেমন্তের হিমকণা-সম্পৃক্ত ঈষৎ-শীতলতা, শীত-ঋতুর নীহার-বহুলা দীর্ঘ যামিনীর দুঃসহ শৈত্যভার পর্য্যায় ক্রমে সমাগত ও পরাবর্তিত হইতেছে, ঐ অখণ্ড নিয়মের অধীন হইয়াই কুসুম-কিঞ্চে কোমল মাধুর্য্য, বজ্রে পর্কতভেদী কাঠোঁঠা, সমুদ্রে দূরবগাহ গাভীর্ষ্য, বসুন্ধরায় অতুলনীয় ধৈর্য্য, পোর্ণনাসী রজনীর প্রাণারাম শ্রীতি-প্রসন্নতা, অনানিশার অন্ধতমসাচ্ছন্ন স্তিমিত বিভীষিকা—ইত্যাদি বিশ্ব-জনীন সমস্ত ঘটনাই উক্ত শাস্ত্র নিয়মের অল্পবর্তী হইয়া সময়ে আবির্ভূত ও অস্তমিত হইতেছে ! বিশ্ব-রাজ্যে এমন কোনও বস্তু নাই—স্থান নাই, বাহার সহিত ঐ মহানিয়মের সমবায়ী সম্বন্ধ না আছে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে—বৈজ্ঞানিক জাহাজের যেমন “কল-কন্ডা”, জগদ্ব্যবস্থার তেমনই “দেবতা”, লৌকিক ভাষায় কল-কন্ডার যেই অর্থ, আধ ভাষায় “দেবতা” শব্দের সেই অর্থ। বস্তুত

দেবতারাই জগদ্ব্যবস্থার পরিচালক ও সামঞ্জস্য বিধায়ক। দেবগণের স্বভাব-সিদ্ধ সমপ্রাণতার সহ্য কর্ষ হইতেই এই সামঞ্জস্যের উৎপত্তি; অখিল বিশ্বের সর্বাদীন হিত-বিধানই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য; শতবিষয়, শত বাধা, শত অন্তরাং—কিছুতেই উহার কণামাত্র ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না। জগদ্বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই মহাসামঞ্জস্যের উৎপত্তি, কাল-ধর্মে নিরন্তর সংস্কৃতি-শক্তির বলবত্তার সঙ্গে সঙ্গে উহার উচ্ছৃঙ্খলিত। যে নিয়মের অধীন হইয়া আদিত্য, চন্দ্র, দিবা-রজনীর উদয়-নয়ন করত সৃষ্টি-রাজ্যের মহোপকার সাধন করিতেছে, ইচ্ছা করিয়া স্বয়ং চন্দ্র-সূর্য্যদেব, তাহার কণামাত্রও বিপর্য্য ঘটাইতে পারেন না; এইরূপে ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, অগ্নি, বায়ু, ঈশান ও নৈঋত দি অসংখ্য অসংখ্য দেবগণ, বিশ্ব-জগতের অন্তরে বাহিরে নিরন্তর বিরাজমান হইয়া, একমনে একধানে ষ্টিমারের কল-কজার মত, যার যার নির্দিষ্ট কর্ষ সাধন করিতেছেন, ইচ্ছা করিয়া কেহই উহার কণামাত্র মাত্রাবিপর্য়্য করিতে পারেন না, তাঁহাদের নিয়মনাথ সর্বাদার জ্ঞান নিয়ন্তর বজ্র-হস্ত উজ্জত রহিয়াছে,—

“যদিদং কিঞ্চিজ্জগৎ সর্কংপ্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

মহদ্বয়ং বজ্রমুজ্জতং য এতদ্বিহরমৃত্যু-স্তে ভবন্তি”।

“ভদ্রাদস্ত্যগ্নিস্তপতি ভয়াতপতি সূর্য্যঃ।

ভদ্রাদিত্যশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ”।

যাঁহাদের দেহ, মন, হৃদয়, প্রাণ পরস্পর সমান, তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত কে কোন কর্ষই সম প্রাণে সমাহিত হইয়া থাকে; ভাবের চক্ষে উহার এক একটি কর্ষই এক এক প্রকারের ব্যষ্টি সাহিত্য। সমপ্রাণতার কর্ষ অক্ষয় ফল-প্রদ, তাঁদৃশ কর্ষের ফল প্রারম্ভই কর্ষীর ভোগে পর্য্যবসিত হয় না, কিন্তু জগতের তরে চিরস্বর্ণময় হইয়া ~~গোং সংসার~~ আসিয়া আঁরা ~~বৈশ্বক্স~~ স্বভাবত চিন্তা-স্থখে উপভোগ করিতেছি, তাহা সমস্তই দৈব-কর্ষের আত্মসদিক শাখত ফল,— তুষায় জল, ক্ষুদ্রায় অন্ন, শীতে আতপ, গ্রীষ্মে মলয়ানিল, অনাবৃষ্টিতে বারিদ-ধারা, অতি বৃষ্টিতে দিবা-প্রসন্নতা ইত্যাদি স্বখ-ভোগ্য বিষয় মাত্রই উল্লিখিত দৈব-কর্ষ-লভ্য। দেবতার আশ্রুতে কিছুই করেন না; প্রতিক্ষণ জাগতিক সনাতন নিয়মের অধীন হইয়া জগতের কল্যাণে জগদ্ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছেন; তাঁহাদের নিজের সত্তা জগতের অস্তিত্বে বিলীন করিয়া, বিশ্ব-ভুবনের বাহাভ্যন্তরে অনবচ্ছিন্ন অনির্বচনীয় মহাভাবের যে এক অক্ষয় প্রবাহ উদ্বেলিত হইতেছে, তাবকের চক্ষে উহাই ‘বিরাট’ সংজ্ঞিত মহাসাহিত্য,— “যএতদ্বিহরমৃত্যুস্ত ভবন্তি,”—ইহার রহস্য যিনি জানেন, মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাহা জানিতে পারিলে মাছুষ অমর হয়, তাহার মূলে কোন্ মহা সত্তা নিরন্তর স্বস্বাদপি স্বস্ব-ভাবে বিলসিত হইয়া সৃষ্টি-রাজ্যের অপর বৈচিত্র্যময় মহিমাম্বিত মহাসত্তা অব্যাহত রাখিতেছে, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞতাই আখ্যাত জাতীয় সাহিত্য-সেবার চরম লক্ষ্য; আপ্ত বাক্যে সেই মহাগত্বই স্বরাজন-স্পৃহনীয় “অমৃত”—“রসোহমৃতং ব্রহ্ম”; - “তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি-নাত্মঃ পশ্বা বিগতেনহন্যম্”—তাঁহার রহস্য জানিতে পারিলেই জীবের মুক্তি ঘটে, তদ্বিধ মুক্তির আ কোন উপায় নাই।

মাছুষ যখন কর্ষ-বিপাক-বশতঃ অধঃপাতের নিয়ন্তরে পৌছিয়া শৃগাল কুকুরের মত অসার জীবনের ভার বহন করিতে করিতে পদে পদে লাক্ষিত ও বিড়ম্বিত হইয়া ক্রমশঃ আত্মার অধোগতিঃ

দিক্ লক্ষ্য করিতে ব্যগ্র হয়, তখন আপনা হইতেই তাহার চিত্তে একটা আত্মোপঘাত জাতীয় উৎকর্ষে হ্রসিহ কণ্ঠন উৎস্থিত হইয়া থাকে। উহা বিশেষ কোন কারণ বশতঃ বীচি-তরঙ্গ স্থায়ে জাতীয় বিরাট সমাজের অঙ্গ স্পর্শ করিলে প্রথমতঃ তাহার অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, তদবস্থায় উহাকে জাত্যুৎকর্ষের 'উন্মাদ' সংজ্ঞায় অভিভাষণ করা যায়; কিন্তু তাদৃশ উন্মাদ দশার প্রশস্তিমূলক সুপরিবর্তন যে নিতান্তই কুচ্ছ-সাধ্য সাহিত্যিক মহাব্যাপার এ কথা আদৌ কেহই বুঝিতে পারে না,—বুঝিতেও চায় না,—বুঝাইতে যত্ন করিলেও প্রায়শঃ বিপর্যয় ফল সংঘটিত হইয়া থাকে! গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ আমরা তাদৃক্ উন্মাদ দশার দারুণ বিশৃঙ্খলতা লইয়া কত প্রকারে কত কি না করিয়া আসিতেছি, কিন্তু ক্রিয়াফলের কোন্ দিকে কি তক স্রসার হইল, না হইল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভগবদিচ্ছায় অদ্য কয়েক বৎসর যাবৎ বঙ্গ দেশে “সাহিত্য-সম্মিলনী” অনুষ্ঠান চলিতেছে; ইহা আমাদের পক্ষে একান্তই শুভাদৃষ্ট ও সৌভাগ্যের সূচনা বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। পরপদানত অকিঞ্চন—নিরুপায় জাতির পক্ষে এতদুপেক্ষা আত্মোৎকর্ষ লাভের সমীচীন ও সুগম পন্থা আর কিছুই হইতে পারে না। যদিও অভাবের অনিবার্য্য দুষ্টিচিন্তা ও দাসত্বের অপরিহার্য্য নির্ঘাতনবিড়ম্বনা-লাঞ্ছনা-বশে কাল-ধর্ম্মে আমাদের দেহ, মন, প্রাণ পরস্পর সর্ব্ব প্রকারেই পৃথগ্ভূত হইয়া আমরা সম্মিলন সাহিত্যসম্মিলনের মহাধিকার হইতে একান্তই ভ্রষ্ট হইয়া বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছি, তথাপি শতমুখে বলিব,—একমাত্র সাহিত্য-সম্মিলনই আমাদের পক্ষে সুস্থতর ভব-তরঙ্গ উৎকর্ষ অক্ষয় তরণি; যদিও মহৎ কথ-সাধনের নিতান্ত অযোগ্য পাত্র মনে করিয়া সাময়িক মানব-জগতের ঐক্যবোধ কন্মিগণ কর্তৃক আমরা যে কোন কর্ম্মের উপক্রমেই পদে পদে আক্রান্ত, উপেক্ষিত ও উপহাসিত হইতাম, তথাপি শত-মুখে বলিব, একমাত্র সাহিত্যিক মিলনই

সাহিত্যিক মিলন—ভব-তরঙ্গ উৎকর্ষের সুপথ; অমোঘ

“ক্ষণস্থিহসজ্জন-সদতিরেকা—

ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥”

জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা উপলব্ধি করত মত্তালোকে সর্ব্বদো ষাহারা সাহিত্যিক মহাভাবে দেহ-মন-হৃদয়-প্রাণ নিয়োজিত করিয়া পরমাভিলষিত অমৃতাহুসন্ধানে সফলকাম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অমাহুবি কৃতি-কুশলতায় একদিন পৃথিবী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সাহিত্যসেবার মহাদুন্দেস্থ সমাহিত হইয়াছিল। সে দিন আর কিরিবে না,—মৃত ভারতে সেই অমৃতের সত্তা আর উদ্ভাসিত হইবে না বলিয়া বর্ত্তমানে ষাহারা নিরাশ হইয়াছেন, অথবা জীবনের লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া কক্ষ-চ্যুত নক্ষত্রের মত যেখানে সেখানে সরিয়া পড়িতেছেন, তাঁহাদের পরিণামদশিতা প্রশংসনীয় নহে। “কালোহ্যং নিরবধিবিপুল। চ পৃথ্বী।” কাল অনন্ত—অসীম, পৃথ্বী বিপুলায়তনা; কাল-ধর্ম্মে একবার যে মণ্ডলী জগতের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহার আর পুনরাবৃত্তি হইবে না, একথা কে বলিতে পারে? সেই মহাসত্ত্ব বা অমৃত বিশ্ব-ভুবনের স্তরে স্তরে নিরন্তর সূক্ষ্মভাবে বিক্ষুরিত হইয়া অনাদি অনন্তকাল পূর্বে যে ভাবে বিলসিত ছিল, আজিও ঠিক সে ভাবেই বিরাজ করিতেছে; তাহার বিশ্বব্যাপী চিদাভাস হৃদয়ে ধারণা করিয়াই অমোঘ নিয়মে নভোমণ্ডলের নিদ্রিষ্ট পথ আবর্ত্তন পূর্ব্বক চন্দ্র, সূর্য্য, নিত্য নিত্য অব্যাহত প্রভাবে ভুবন আলোকিত করিতেছে; সেই মহাসত্ত্ব বা অমৃতের সত্তা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াই সৃষ্টিরাজ্যের নিদানভূত বিষদাদি মহাভূত-সংঘাত, অনাদি

অনন্ত কাল হইতে একই ভাবে বিরাজিত হইয়া শাস্ত্র নিয়মে জগতের অভাবনীয় বৈচিত্র্য রক্ষা করিতেছে; সেই মহাস্রবের অচিন্ত্য সত্তা অস্ত্রশস্ত্রে ধারণ করিয়াই অন্তরীক্ষে সৌদামিনীর গগনবিসারি উদ্গম নাধূম্য, —ভূতলে নিয়ত পরিবর্তনশীল। শস্য স্রবসাময়ী শ্রীমতী বসুমতীর নিত্য নবীভূত স্পৃহণীয় সৌন্দর্য্য, বনস্থলে তরু-গুহ-লতা মগুরীর শাখা-পল্লব মুহূলে নয়নাভিরাম ফল-কুসুম-লাবণ্য-লহরী, ক্ষণ-স্থায়ী হইলেও, চিরন্তনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে! সেই মহাস্রবের অব্যক্ত অমিয় সত্তা অজ্ঞাতসারে অন্তরে লইয়াই বিচিত্রনির্মাণ দেহাভিমাত্রী জীবগণ, নিরন্তর অহঙ্কারে ক্ষীণ হইয়া, কক্ষাভূষায়ী ফল ভোগের জগৎ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অতুসরণ করিতেছে;—সেই আমরা, আজীবন অশেষ যাতনা—অশেষ লাঞ্ছনা ও অশেষ বিড়ম্বনা ভুগিয়াও দারুণ অহংভাবের মূঢ়তা-বশেই ক্ষণকালের জগৎ দৃষ্টি শক্তি অন্তর্মুখী করিতে সমর্থ হইতেছি না।—সঞ্চিত বিদ্যার অপব্যবহার করিতে করিতে ইদানীং জীবদবস্থায় মৃত্যু-মুখের প্রণয়ান্বিত হইয়া বিষম সমস্যার উপনীত হইয়াছি! এ সময় অন্তর্দর্শিতা দ্বারা স্তম্ভহং সাহিত্য-সম্মিলনের অন্তর্নিহিত সেই মহাস্রব বা অমৃতের সত্তা উপলব্ধি করিতে না পারিলে, আমাদের—কেবল আমাদের কেন—ভোগ-বিলাসোন্মত্ত মানব-জগতের পরিত্রাণের আর উপায়ান্তর দৃষ্ট হয় না।

অন্তর্দর্শিতা সাহিত্যের প্রাণ; সাহিত্য প্রাণের আরামস্থল। যে শ্রেণীর সাহিত্যসেবায় অন্তর্দৃষ্টি পুষ্ট হয় না,—সমাজের কল্যাণে আত্মার ব্যগ্রতা জন্মে না, কেবল পদে-আপদে—ভাবে-অভাবে—তালে-বেতালে বেলার মত, ভাষার বা কন্ঠের প্রসার বদ্ধিত হয়। তদ্বারা সাহিত্য “সেবায়” বা “সম্মিলনের” উদ্দেশ্য কন্যামাত্র পূর্ণ হইতে পারে না; বেলার সমকালে নৈসর্গিক নিয়মে সমৃদ্ধ, নির্দিষ্ট সময়ের জগৎ উদ্বেলিত হইয়া, প্রাণ-বর্ধন দূর দূরান্তবস্ত্তী, নদীমাতৃক, তৃণ লতা-পুষ্প-শস্য-শোভন সজল ভূমিই অকিঞ্চিৎকর থাকে, দ্বারা তটান্তরী নিত্য-স্রব দক্ষতার কিছু মাত্রই প্রতিকার হয় না। যে কন্ঠে লৌকিক জগতের স্নিগ্ধতা ও মরুতা, কৌমার্য্য ও কাঠিন্য, সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যতা, সরলতা ও কোটিল্য, ধীরতা ও মূর্খতা, ভাব ও অভাব, সাম্য ও বৈষম্য এবং মরুতা ও অমরতার সামঞ্জস্য বিহিত হইয়া বিরাট সমাজের অন্তঃস্তরের সর্ব্ব মঙ্গলে এক অনির্করনীয় দিব্য ভাবলহরীর সঞ্চারণ না হইবে, সে পর্য্যন্তই সাহিত্য সেবা বা সাধনার প্রয়োজনীয়তা। এই স্বকঠোর সাধনা প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যে দিন আবার ভারতের পবিত্র ঘটে ঘটে, কুটারে কুটারে, বিপিনে বিপিনে, কুহরে কুহরে সাহিত্যের অন্তর্ভাবে আত্মহারা হইয়া সাহিত্য নায়কগণ কর্তৃক উদাত্তাদিশ্বর-সংযোগে মানব-জগতের সর্ব্বজনীন উদার উজ্জ্বল উদ্গীর্ণ হইবে,—

“মধুবাভা ঋতায়তে মধু করন্তি সিদ্ধবঃ।

মাকী-নঃ সঃস্বাধিঃ ॥

মধু নক্লমুতোষসো মধুযং পার্থিবং রজঃ।

মধু তোরন্ত নঃ পিতা ॥

মধুমান্নো বনস্পতি-মধুমানন্ত সূর্য্যঃ।

মাকী-গীবো ভবন্ত নঃ ॥”—

উহাই ‘সাহিত্যের’—“সাহিত্য সম্মিলনের” স্বদিন। সে শুভদিন না আসিতে প্রাণের আরাম

ঘটিবেনা,—তৃষ্ণার শাস্তি হইবেনা ; আশার কূহকে ভুলিয়া যিনি যাঁহাই করুন না কেন, সাহিত্যিক মহাভাবে প্রাণের আরাম না ঘটিলে, সেই প্রাণারামরূপ পরমানন্দ রসামৃতের অল্পসন্ধান লইবে কে ?—

জগতের সমস্তই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেই প্রাণারাম রসের জ্ঞান লালায়িত ; দেবগণ সেই পরমানন্দ রসের স্বাদগ্রাহী হইয়াই অনন্তকালের জন্য মৃত্যুর করাল শাসন অতিক্রম পূর্বক একই ভাবে অহনিশ অনন্ত জগতের অতীন্দ্রিয় কর্মযোগ সাধন করিতেছেন ; তাহার পরমাস্বাদ পাইয়াই মহতী শ্রুতি, যুক্তি তর্ক পরিহার করত মৌনাবধন পূর্বক জ্ঞান গভীর ঘোষণা দিয়া আত্মানন্দ রসোল্লাসে সে স্বয়ং নিব্রুতিলাভ করিয়াছে ; সেই পরমরসের তথ্যাল্পসন্ধানার্থ দর্শন-জগতের রহস্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারণা করিয়া শ্রেয়ঃ পন্থা প্রদর্শন করিয়াছে ; স্মৃতি তাহারই অল্পসন্ধানের পথ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য দেশ-কাল-পাত্রাহুযায়ী রাশি রাশি সদাচার সঙ্কলন পূর্বক যুগে যুগে সমাজের নব নব সংস্কার সাধন করিয়াছে, পুরাণ, তাহারই পথে পদার্পণ করতঃ সেই একই রসামৃতের অনন্ত স্বাদ উপলব্ধি করিয়া, কালধর্মতুর্কল মানব সমাজের ঘটে ঘটে কালোপযোগী অনন্ত ভাবের সমাবেশ করিয়াছে, বিজ্ঞান তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে গিয়া জাগতিক পদার্থ-তত্ত্বে গ্রন্থিধান পূর্বক পুরুষকারের উপসর্গে মানব-জগৎ স্তম্ভিত করিয়াছে,— কিন্তু এতাদৃশ স্তম্ভনকারিতার পরিণাম, সেই প্রাণারাম রসাল্পসন্ধানের পথে অগ্রসর হইবে কিনা, ভগবান জ্ঞানেন।

প্রাণের স্বয়ং সত্তার একত্ব বা সমতা প্রতিপাদন করাই সাহিত্যসাধনার চরম উদ্দেশ্য । এ মহদুদ্দেশ্য প্রকৃত কার্য্যমূল পরিচালিত হইলে, একদিন না একদিন অবশ্যই—“স উ প্রাণস্ত প্রাণঃ”—প্রাণারাম পরমানন্দ রসামৃতের অল্পসন্ধান সফল হইবে ;—“তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নানাঃ পন্থা বিদ্যন্তে নারয় ।”

কবীরের দোঁহা

মন

(পূর্বস্বরূপিত)

কবীর মনহিঁ গজন্দ হৈ, আংবুস দৈদৈ রাখু ।

বিষকী বেলী পরিহরো, অমৃতকা ফল চাখু ॥ ৫২ ॥

কবীর এ মন ঐরাবতে, ভাঙস মেরে মেরে রাখ ।

বিষের লতা ত্যজ্য কর, অমৃতের ফল সদা চাখ ॥ ৫২ ॥

কায়া দেবল মন ধুজা বিষয় লহরি কহ রায় ।

মন চালৈ দেবল চলৈ, তা কো সরবস জায় ॥ ৫৩ ॥

কায়া দেউল মন ধুজা তার, বিষয় লহর উড়ায় তারে ।

সকলি তার ঘুচে যায় যার, মনের বলে দেউল ফেরে ॥ ৫৩ ॥

—শিব প্রসাদ ।

অক্ষর-ব্রহ্ম

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু

“অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং” অর্থাৎ অক্ষরই পরম ব্রহ্ম। গীতাতে শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন। অক্ষর উৎপত্তি ও বিনাশ বর্জিত, বাহার ক্ষরণ হয় না, সকল অবস্থাতেই যাহা এক রূপ থাকে। অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণের কখন বিচ্যুতি হয় না, এজ্ঞা উহাদের অক্ষর বলা হয়।

হয়ং ব্রহ্মাই অক্ষরের স্রষ্টা ও বেদের প্রকাশক।

যে সময়ে তিনি বেদ প্রকাশ করেন, তখনই তিনি অক্ষরের স্রষ্টি করেন। ছয় মাস অন্তর মানুষের ভ্রম হয়, ইহা বুঝিয়া তিনি অক্ষরের স্রষ্টি করেন।

“যা মাসিকেহপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে নৃণাম্।

ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রাক্রটাত্ততঃ পুরা ॥”

অক্ষর ও শব্দ স্রষ্টি করার শক্তি মানুষের নাই, তাহার জহ দেবতার আবশ্যক হয়। আদি দেবতা ব্রহ্মা, তিনি পরমাত্মার সংকল্প হইতে উৎপন্ন হন এবং পরম ব্রহ্ম হইতেই পিতামহ ব্রহ্মা বেদ-জ্ঞান প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মাই আমাদের আদি গুরু এবং বেদ প্রকাশক। ইনি সনৎ সনাতন শিদ্ধগণকে বেদ ও বর্ণোপদেশ করেন। তাঁহার ঋষি-পরম্পরাকে উপদেশ দেয় এবং তাঁহারাই সেই উপদেশ মন্ত্রম্বলোকে দান করেন।

সর্বপ্রথমে অক্ষর ও শব্দ, পরে ব্যাকরণ স্রষ্ট হয়।

প্রথমতঃ শব্দ অর্থও ছিল, পরে দেবরাজ ইন্দ্র তাহা বিচ্ছেদ করিয়া ব্যাকৃত করেন, অর্থাৎ স্বরভিত্তি, প্রত্যয় ও বিভাগ করিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি করেন। বাহাতে অল্প সময়ে সমস্ত শব্দ জন্মিয়া যায়, এমন কোন লঘু উপায়ের আবশ্যক হয়। সেই লঘু উপায়ই ব্যাকরণ। স্বয়ং মহাদেব এই ব্যাকরণের স্রষ্টা,—তৎকৃত ব্যাকরণের নাম মাহেশ। তিনি বর্ণসমারাম্যাক চতুর্দশ সংজ্ঞা স্রষ্ট প্রণয়ন করেন এবং উহা অবলম্বন করিয়া মহামুনি পাণিনি বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। সংস্কৃত অক্ষর স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক স্রষ্ট। সমস্ত সংস্কৃত বর্ণই দেবাত্মক। প্রত্যেক বর্ণের রূপ, অর্থ ও দেবতা আছেন। বর্ণাভিধান তন্ত্রে প্রত্যেক বর্ণের স্বরূপ ও অর্থাদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

হিন্দুরা ভক্তিমান্, তাঁহার জগৎময় সর্বত্র ঈশ্বরের বিভূতি দেখিতে পান। সমস্ত বর্ণে ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বরবর্ণের আদ্যাক্ষর অকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব শক্তি বিরাজ করিতেছেন।

সংস্কৃত অক্ষরের লিখন-প্রকার, অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, শক্তি, বর্ণ ইত্যাদির বিষয় কামধেনু তন্ত্রে, বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে ও বর্ণাভিধান তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

বর্ণ দ্বিবিধ—স্বর ও ব্যঞ্জন। স্বরবর্ণ ১৪টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৬টি। ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণকে

শিব আর অকারাদি স্বরবর্ণকে শক্তি বলে। শিবশক্তি মিলিত হইলে অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত স্বরবর্ণ যুক্ত হইলে, বেদাদি উচ্চারিত হয়।

শব্দ নিত্য, উহা উচ্চারণ কালে আবির্ভূত হয় ও অন্তঃস্বরণ কালে ব্রহ্মে লীন থাকে। অক্ষর অখণ্ডরূপে ব্রহ্মে লীন থাকে, সেই জন্ত অক্ষর ব্রহ্মের ত্রায় নিত্য।

বর্ণ দুই প্রকার—ধ্বন্যাত্মক ও অক্ষরাত্মক। অক্ষরাত্মক শব্দ বর্ণাত্মক অক্ষরের বীজ স্বরূপ। পরমেশ্বর অক্ষররূপ বীজ হইতে সৃষ্ট পদার্থের বাচক বর্ণাত্মক শব্দরাশি সৃষ্ট করিয়াছেন। শব্দ সৃষ্টি ও পদার্থ সৃষ্টির প্রণালী একরূপ, উভয় সৃষ্টি প্রণালীই একরূপ। ঈশ্বরের অংশ জীবরূপে জীব দেহে বর্তমান এবং এই জীব দেহেই পরমাত্মাও অন্তর্যায়ীকরূপে আছেন।

“দেহকে যদি জানিতে পার ভাল মনে
দেহে’ত সকল আছে এ চৌদ্দ ভুবনে।”

“সকলের সার হয় আপন শরীর
নিজ দেহ জানিতে আপনি হবে স্থির।”

দেহিগণের মূল্যধারে একটি নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীটি মর্পের ত্রায় কুণ্ডলীভূত, সেই জন্ত উহার নাম কুণ্ডলী। ইনি পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী অর্থাৎ যাতক্যাবর্ণ-স্বরূপিণী।

জগৎ মন্ত্রময় এবং মন্ত্র সর্বার্থ-সাধক।

ঐ কুণ্ডলী সকল বর্ণের মিলিত হইয়া মন্ত্রময় জগৎ প্রকাশ করেন। এই কুণ্ডলিনীই শব্দ ও শব্দার্থের প্রবর্তিনী। ইনি শব্দ প্রপঞ্চের জননী এবং দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণে মিলিত হইয়া পঞ্চাশদ্বর্ণময় বর্ণমালায় উদ্ভাবন করেন। এই দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণময় বর্ণমালাই ভূতলিপি মন্ত্র। কুণ্ডলিনী সর্বশক্তিময়ী ও শব্দব্রহ্মরূপিণী। ইনিই বর্ণমালা প্রসব করেন। কুণ্ডলিনী হইতে শক্তির বিকাশ, শক্তি হইতে ধ্বনি, ধ্বনি হইতে নাদ, নাদ হইতে নিরোধিকা, নিরোধিকা হইতে অক্টেন্দু, অক্টেন্দু হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে পরের উৎপত্তি।

ব্যাকরণ মতে, বর্ণসমূহের উৎপত্তি স্থান আটটি, যথা—হৃদয়, শির, জিহ্বা, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠদ্বয় ও তালু।

অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শির-স্তথা।

জিহ্বামূলঞ্চ দস্তাশ্চ নাসিকেহষ্ঠৌ চ তালুকা ॥

আমাদের দেহ মধ্য হইতেই পঞ্চাশৎ বর্ণ বা অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ণসমূহ সমীর সঞ্চালিত হইয়া শূন্য নাড়ীর রক্ত মধ্য দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। পরে কণ্ঠাদি স্থান আলোড়িত করিয়া বদন বিবর দিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়।

অক্ষর হইতে মন্ত্র, মন্ত্র হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান দ্বারা জীব মুক্তিমুক্ত করে।

(দ্রুগশঃ)

বঙ্কিম-প্রতিভা

শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্মা

(পূর্বানুগতি)

সাহিত্য ও বঙ্কিম-সাহিত্য

ভারতবর্ষীয় ধারাবাহিকতায় দেখিতে পাই যে, আঙ্গিকে যাহাকে সাহিত্য বলিতেছি ঠিক সেইরূপ সাহিত্য এদেশে ছিল না। কাব্য ছিল, কিন্তু উপন্যাস বা নভেল ছিল না। গল্প ও কাহিনীর মধ্য দিয়া অনেক নীতি কথা কথিত হইত; কিন্তু কাল্পনিক স্বথ দুঃখের কাহিনী করিয়া লোক-রঞ্জনের কোন প্রচেষ্টাই কখনো দেখা যায় নাই। মাছুষের জীবনের সামান্য সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, অহরাগ বিরাগকে রঞ্জিত করিয়া যে সাহিত্যিক প্রচেষ্টা আজ দেখিতেছি, তাহা ঠিক এদেশের নহে। এ দেশে গল্প আছে, কিন্তু তাহা নীতি কথায় পরিপূর্ণ।

পৌরাণিকতা সমগ্র মানবতার পরিচয়। উহাতেও মনুষ্যত্বের সমগ্র অংশ বিবৃত ও বিধৃত। পৌরাণিক ঘটনা মনুষ্য সমাজের পাপ-পুণ্য, প্রেম-প্রীতি, রাজ্য-সমস্ত কিছুকেই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহা একটু লোকোত্তর, একটু উচ্চ, বহুতের প্রতি একটু দৃষ্টি-পরায়ণ। বাণ বা দুৰ্য্যোধনের কলুষাচারের কাহিনীও পুরাণ কথায় কথিত হইয়াছে; কিন্তু তাগ এখানেই থামিয়া যায় নাই। উহা একটু পক্ষা মাত্র। একটা সমস্ত বিচারে উচিত— উজ্জল করিয়া চিত্রিত করিয়া জহই অমনি পাপপঙ্কিল চরিত্রের অঙ্কন। পুরাচার দুঃখ দৈবী; প্রেম দৈবী তাহার সমগ্র কিছু অসামান্যতায় দ্যুতিমান।

সমগ্র নন্দনদী যেমন সমুদ্রের অভিমুখে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের সার্থকতা সম্পাদন করে, সমগ্র পৌরাণিক ঘটনাও তেমনি চলিয়াছে—এক মহিম্ন অবস্থার দিকে। এমন কি যখন দেবলোক হইতে মর্ত্যলোকেও আসিয়াছি, তখনও মর্ত্যে জালিয়া দিয়াছি অমর্ত্যের দীপ্তিহ্রাস। বেহলা বা খুলনা একজন বঙ্গকুল নারী, কিন্তু তাহাদের সেই মানবী জীবন দেবী জীবনেরই রূপান্তর। বেহলা শুধু বিরহিণী নহে, তিনি সেই সাবিত্রীরই সম সমব্রত-চারিণী। মাছুষী প্রেম-প্রীতি, অহরাগ-বিরাগ, বিরহ-মিলনের যে ক্ষুদ্র মনোচাক্ষুণ্য বেহলার অকাল বৈধব্যে তাহার স্পর্শ অতি ক্ষীণ! হয়ত বা নাই। মৃত স্বামীকে জীবন দান বাসনা। মৃতের জীবন—যাহা অধ্বব—একান্তই অনিশ্চিত। মৃত গলিত স্বামীকে লইয়া এক অনির্দেশ যাত্রা!

ইহাকেই পুরাণী রীতি বলিতেছি। এই রীতির যে মর্ম্ম তাহা লইয়াই বিশাল ভারতবর্ষের জন-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। লৌকিক হইলেও লৌকিকতা-বিহীন! মাছুষী হইলেও অমাছুষী! গীতাও মানবী ছিলেন, বেহলাও তাহাই। কিন্তু তাহাদের আবির্ভাব ছিল লোকোত্তর। আর সেই লোকোত্তর সাহিত্যই যুগের পর যুগ এই ভারতবর্ষীয় জাতি উপভোগ করিয়া আসিয়াছে।

যে যুগে বহ্নিমের আবির্ভাব, সেই যুগে এই চিরন্তনী রীতির কতকটা যেন পরিবর্তন ঘটিল। মানবচিন্তা আবার নতুনো নাগিয়া আসিল। দেব ও দেবী আদর্শ ও পুণ্য—এ সব যেন পুরাতন হইয়া গেল কিম্বা বিতৃষ্ণার হইয়া উঠিল।

ভারতবর্ষীয় চিন্তের নিজস্ব আবেগে যে এমন পরিবর্তন ঘটিল তাহা বলিতে পারি না। নব্য শিক্ষার আলোকে অতীন্দ্রিয় লোক হইতে বহির্জগতের দিকে ভারতবাসীর চিত্তকে আকৃষ্ট করিল। যুরোপীয় সাহিত্য পাঠ করিয়া দেখিতে ও চিনিতে শিখিলাম যে, সাধারণ জীবন-যাপনার মাঝেও সাহিত্যের অসাধারণত্ব রহিয়াছে। দৈনন্দিন প্রেম অল্পরাগের মাঝেও রহিয়াছে কত রোমিও-জুলিয়েট! কত দেশভিমনো-মিঃ! এই অকস্মাৎ পরিচয় বিশ্বয়ের সহিত একেবারে আনন্দ-আকুলিত করিয়া তুলিল।

সাহিত্যে রূপান্তর ঘটিল। বহ্নিম-যুগের এবং আধুনিক যুগের সাহিত্য সৃষ্টির ইহাই ইতিকথা। আধুনিক সাহিত্যে আবার শৈলী-বায়রণ-সেক্সপীয়র-স্কট নহেন, সমগ্র যুরোপীয় সাহিত্যের স্পর্শ ও প্রভাব। এ কথা বাউক্‌।

বহ্নিম-সাহিত্য ভারতের বিগত দিনের সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন ধারা নহে; আবার একান্ত আকস্মিকও নহে। ভ্রমর বা সূর্য্যমুখী একান্তভাবে নীতা সাবিত্রীও নহে; আবার জুলিয়েটও নহে। বহ্নিম-প্রতিভায় নব যুগের যে প্রভাব পড়িয়াছিল তাহাতে এক অভিনবত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। উহা এতদূর পরিচিত নূতনকে আনিয়া দিয়া ছিল বটে, কিন্তু পুরাতনের চির পরিচয়কে লঙ্ঘন করিয়া চলে নাই। বহ্নিমই সূর্য্যমুখী স্বামীকে স্বধী করিবার জন্য কুন্দকে বিবাহ দিয়া আপনি মরিতে পড়িয়াছিল। অভিনবত্বই সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ। পুরাণী লোকোত্তর সাহিত্য হয়ত নীত না হইত। বহ্নিমই সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ। পুরাণী লোকোত্তর সাহিত্য হয়ত নীত না হইত। বহ্নিমই সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ। পুরাণী লোকোত্তর সাহিত্য হয়ত নীত না হইত।

সাধারণ জীবনে কল্পনার রঙ্গনে বিরহিত করিয়া ঐ তৃপ্তিকর আনন্দে অন্ধনই উপন্যাস-সাহিত্যের কার্য। নিত্য পরিচিত নহে, একটু অপরিচিত ভাব ও ভাষা। নিত্যকার ঘর সংসার যে রীতি নীতিতে চলে, ঠিক সেইরূপ নহে। উপন্যাসের নর নারী নায়ক নায়িকা। সংসারের ধূলিমালা ও দুঃখস্বপ্নের সহিত তাহাদের সঙ্গর্গ নহে। ঔপন্যাসিক নর নারীর যে স্বপ্ন দুঃখ, বেদনা ব্যথা তাহা একান্তই বিাহ প্রণয় ঘটিল। অবশ্য আধুনিক দিনে বাস্তব সাহিত্য বহিয়াও এক ত্রৈলোক্য উপন্যাস-সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহার বাস্তবতাও নানা কারণে যথার্থ বাস্তবত্ব হইতে পারে নাই। সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

পৌরাণিকতা মানবের অধ্যাত্ম সম্পদ। উহার প্রয়োজন মানবের আধ্যাত্মিক সন্তান পরিপুষ্ট করিতে। সমগ্র মানব জীবন কিন্তু একান্ত অধ্যাত্মমুখী নহে। সে তাহার ইন্দ্রিয় দিয়া, মন দিয়াও বিশ্ব-সৃষ্টিকে উপভোগ করিতে চাহে। তাহা ছাড়া মানবস্বভাবের আছে এক নিম্নাভিমুখী ভোগপরায়ণতা। প্রায় অধিকাংশ মানবই ভোগ করিতে চাহে তাহার ইন্দ্রিয় নিচয় দিয়া এবং তাহার মন দিয়া! রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্য পেয়েও মাহুষ ভালবাসে, আবার ভালবাসে গান শুনতে, কাব্যপাঠ করিতে। এই মানসিক উপভোগ হইতে উপন্যাস সাহিত্যের সৃষ্টি। সাধারণ জীবনে সন্তুষ্ট যাহা চাহে, অথচ পায় না; তাহাই পাইতে গিয়া সে সৃষ্টি করিয়া

ফেলিয়াছে উপন্যাস-সাহিত্য। ইহাকে বলা যাব যে “আপন মনের মাধুরী মিশ্রায়ে তেঁমারে করেছি রচনা”।

মাধুৰ্য গল্পপ্রিয়। কাহিনী শুনিতে সে ভালবাসে। উপন্যাসে আখ্যানভাগ থাকিলেও তাহা গোণ অংশ। কাহিনী উপন্যাসের একটা পরিপ্ৰেক্ষা। না থাকিলে নয়, তাই আছে। বক্তব্যকে ছুট করিয়া তুলিতেই উপন্যাসের গল্পাংশের প্রয়োজন। ইহার মূল কথা, পরিচয়ের মাঝে একটা অপরিচিত হৃদয়কে সৃষ্টি করিয়া তাহারই মাধুর্য উপভোগ করা।

বঙ্কিম-উপন্যাসও এই রীতির অনুবর্তী হইয়া চলিয়াছে। তবে, তিনি উপন্যাসের মধ্যে কোথাও উপ-মনোবৃত্তি ও উপ-ধর্মকে অঙ্গীকার করেন নাই। যুরোপীয় উপন্যাসের প্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরীর সম্বোধনের অবলম্বন। বঙ্কিমের চিত্রিত প্রেম ভারতবর্ষীয় সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্য একান্ত ভোগপ্রবণ প্রেমচিত্র অঙ্কিত করে নাই বা অঙ্কিত করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের “চন্দ্রশেখর” উপন্যাসের প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেম কাহিনী পাশ্চাত্য প্রণয় রীতির পূর্বরাগের অনুসরণ করিতে করিতে একেবারে পূর্বাভিমুখী হইয়া দাঁড়াইল। এ বিষয় পরে বিশদ-রূপে আলোচনা করিব। এখানে এই মাত্র বক্তব্য যে গল্পাবলী প্রতাপ শৈবলিনীর সহিত দ্বিতীয়বার সাতার দিতে গিতে শৈবলিনীকে সপথ করাইয়া লইলেন যে প্রতাপকে ভুলিতে হইবে। নহিলে তিনি কৈশোরে একবার যেমন ডুবিয়াছিলেন, আবার তেমনি ডুবিবেন। এই গল্পাংশ সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভোগমুগ্ধ শারীরপ্রেমকে বলি দিলেন।

সাহিত্য তৃপ্তিকর। এই তৃপ্তি আবার যেমন তেমন হইবে। একটু উন্নত পর্য্যায়ের। একটু কেন, অনেকটুকু। মানবের তৃপ্তি তৃপ্তির একটা দল আছে। কেহ কেবলমাত্র ভোগ বিলাসে তৃপ্তিপায়। কেহ বা পায় সেব্য ও ত্যাগে। কেহ কষ্টে। কেহ ত্যাগে। প্রমোদাগারে ভোগ-বিহ্বল হইয়া মানব তখন জনকল্যাণের জগৎ ধ্যানমগ্ন অথবা ব্রতপরায়ণ। শিষ্ট মানবতা তৃপ্তি-তৃপ্তি ও শিষ্ট-সংযত, ভোগ বিমুখ।

সাহিত্য মানসিক তৃপ্তির উপাদান। যে তৃপ্তি তৃপ্তি সাহিত্য উপহার দিবে, তাহাও হইবে শিষ্ট, শিষ্ট এবং শুভঙ্কর। সংসারী জীব বাহারা সমাজ গঠন করিয়া স্বতঃশান্তিতে জীবন যাপন করিতে চাহে, রাষ্ট্র রচনা করিয়া বাহারা চাহে সামাজিক মানবকে রক্ষা করিতে, তাহাদের আনন্দও একান্ত উদ্দেশ্যহীন নহে। নহেক যথেষ্টাচারী। কাজেই সাহিত্যিক আনন্দও একান্ত উন্মার্গপন্থী নহে। তাহার আছে একটা বৈধতা, আছে রক্ষণশীল মনোধর্ম।

সমুন্নত সাহিত্য মাঝেই নীতিধর্ম্মাঙ্গ। সমাজ সমষ্টির কল্যাণকর। আনন্দও কল্যাণ, নীতি-ধর্ম ও তৃপ্তি-তৃপ্তি একান্ত পরিপন্থী নহে। আনন্দ অবশ্য একটা মধ্যবর্তী বস্তু। নীতিও নহে দুর্নীতিও নহে, অথচ আনন্দ লাভ হয়, এমন বস্তু সংসারে দুর্লভ নহে। সঙ্গীতের স্বরে চিত্তবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়। স্বরের মধ্যে কেবল একটা তৃপ্তির স্পর্শ রহিয়াছে। এমন স্বরও অবশ্য আছে যাহা একটা কোনও বিশিষ্ট আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে। তবুও এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, বিশুদ্ধ আনন্দ বলিয়া একটি বস্তু আছে।

কিন্তু আনন্দ মাঝেই এমন নহে। মনুষ্য প্রকৃতি নীতিতেও আনন্দ লাভ করে, দুর্নীতিতেও আনন্দ পায়। বরং এইরূপ একটা বস্তুগত আনন্দেরই সংখ্যাধিক্য। শরদিন্দুর শুভ চন্দ্রিকা

দেখিয়া আমরা যত আনন্দ পাই, কোনও মহৎ বৃত্তির লীলা-মাহাত্ম্য দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী হই। হরিশ্চন্দ্রের সত্যব্রত, ভীষ্মের শরশয্যা, শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃসত্য রক্ষার্থ নির্বাসন স্বীকার, এই সব কোনও চারুতর প্রাকৃতিক দৃশ্য, অথবা কুসুম সৌরভ কিম্বা বাঁশরীর স্বর লহরীর অপেক্ষা অধিকতর তৃপ্তিকর। অবশ্য, কুরুচিও এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে সুখকর।

সাহিত্য—প্রাকৃতিক শোভা অপেক্ষা মানসিক সৌন্দর্য লইয়াই বিভোর। প্রবৃত্তি অহুসারে সাহিত্যে কখন মহৎবৃত্তি সমূহকে চিত্রিত করা হয়, কখন বা কলুষিত ভাবও অঙ্কিত হয়। বঙ্কিম চন্দ্র সাহিত্য-রস সৃষ্টি করিতে গিয়া পবিত্রতাকেই বরণ করিয়াছেন। লোকচিত্র বিনোদনের জন্ত কখনও মন্দ কিছুকে অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই। তাই ‘কৃষ্ণকান্তের উইলো’ রোহিণী মরিয়াছে। এবং ভোগী গোবিন্দলাল প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মাণুষ সংসারী জীব। লাভ লোকসান হিসাব করিয়া চলাই তাহার—স্বভাব। একান্ত নিকামভাবে কেহ কিছু করেনা; অদ্যতঃ জনসাধারণ করে না। প্রত্যেক মাণুষ প্রত্যেক পদক্ষেপে শুভকে চাহিয়া চলে। এই শুভের নাম—নীতি, ধর্ম এবং উপকারও বটে। অনর্থক কিছু করাও আছে বটে; কিন্তু তাহার মাত্রা অতি কম। আর তাহাকে বলে দুর্ভিক্ষ। সাহিত্য সভ্য ও শিষ্ট মানবতার আনন্দের উপাদান। কাজেই সাহিত্যেও অনর্থক কিছুই চলে না। যাহা দুর্ভিক্ষ-প্রসূত, তাহা অচল। বঙ্কিম-সাহিত্য এই কল্যাণের দিক দিয়া অত্যন্তই নিষ্ঠাবান। মঙ্গলকে অতিক্রম করিয়া বঙ্কিম-সাহিত্য কখনও চলিতে চাহে না। “উত্তর-রাম” চরিত সমালোচনার বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, আপনাতঃ সাহিত্য সৃষ্টিতেও তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন।

সাহিত্যেও তাহাই। উদ্দেশ্য সাহিত্যেরও তাহাই।

না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র নীতি-কথা রচনা করেন নাই বটে; অর্থাৎ চিন্তা শুদ্ধি। শুদ্ধচিত্তই আনন্দিত চিন্ত। বঙ্কিমচন্দ্র নীতি-কথা রচনা করেন নাই বটে; কিন্তু যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে চিন্তা মালিন্য ঘটে নাই বরং চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন। “বিষবৃক্ষ” হউক, অথবা “কৃষ্ণকান্তের উইলো” হউক, বঙ্কিমের সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যে, প্রথম-বৈচিত্রের মধ্যে ধনিয়া উঠিয়াছে এক অনাবিল স্বর।—যাহা চিত্তবৃত্তিকে এক শুদ্ধতারই অভিমুখ করিয়া তোলে।

কখনই সাহিত্য উদ্দেশ্যহীন নহে। পাঠক সমাজকে আনন্দ দান করাই সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যটা গৌণ ভাবে না থাকুক মূখ্য ভাবেও রহিয়াছে। সাহিত্যিক সে আনন্দ তাঁহার অল্পভূতি দিয়া উপলব্ধি করেন, তাহা বাক্য ভাষার ভঙ্গিমায় ফুটাইয়া তোলেন, তখন যে নিরর্থক আঁধারে লেখা জোখা করেন—এমন বলিতে পারি না। অপরকে আনন্দ দানের উদ্দেশ্যও তাহাতে নিহিত থাকে।

কৃষ্টি অল্পবায়ু আনন্দের রূপ নির্ধারিত হয়। আনন্দ ও উল্লাস সর্বত্রই এক নহে। ব্যাভিচারেও কেহ কেহ সুখ অল্পভব করে। অন্যাকার অনেকের কাছে রোচক। যাহারা এই শ্রেণীর, তাহারা শিষ্ট ও সভ্য সমাজের উপযুক্ত নহেই, পরন্তু একান্ত গবহেলিত। সাহিত্যিক আনন্দের মধ্যেও একটা শিষ্টতা থাকা প্রয়োজন। আনন্দ মাত্রেই গ্রাহ্য নহে। দেখিতে হইবে তাহার গতি প্রকৃতি কিরূপ। শৌণ্ডিকালয়ের চতুষ্পার্শ্বে এক শ্রেণীর বিভ্রম উল্লাস দেখিতে

পাওয়া যায়। উহা ভঙ্গ্যমাজের ব্যবহারিকতায় যেমন সর্বথা পরিত্যজ্য, তেমনি ভাবে পরিত্যজ্য সাহিত্যে। ব্যবহারিকতায় যাহা ঘৃণ্য, তাহা সাহিত্যেও পরিবর্জনীয়।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন এবং চিত্তপ্রফালন। বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শানুযায়ীই তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-শিল্পকে আকার দান করিয়াছেন। ‘উত্তররাম চরিতের’ আলোচনা করিতে গিয়া কথাটা তিনি বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন :—কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গোঁণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিন্তোৎকর্ষ সাধন। চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরাজগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ স্বজনের দ্বারা জগতের চিত্ত শুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।—বিবিধ প্রবন্ধ—উত্তর চরিত।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস সাহিত্যে এই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি কোথাও নীতি কথার প্রবক্তা হন নাই; কিন্তু তাঁহার সাহিত্যশিল্প পরম সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া চিত্তশুদ্ধি সংসাধিত করিয়াছে। “মৃণালিনী”, “দুর্গেশনন্দিনী” প্রভৃতি প্রাথমিক গ্রন্থে পূর্বরূপকে অনুসরণ করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টির একটা প্রয়াস দেখা গিয়াছে বটে; কিন্তু তাহা হইতে চিত্তে কোনও আবিলতা সংক্রান্ত হয় নাই; হইয়াছে—একটা পবিত্রতার উদ্বোধন।

সাহিত্যের যদি কোনও বাস্তব উপযোগিতা থাকে, তবে ইহাই। ব্যবহারিক জগতে যাহা আছে এবং হইতেছে, কল্প জগতে তাহার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহাও যে আনন্দ পাওয়া যায় না, মানসিক লোকে তাহা সৃষ্টি করিয়া তোলাই সাহিত্যের কার্য। একটা বিশুদ্ধ আনন্দ, একটা উদ্বোধিত অন্তরাত্মা, একটা পরিশুদ্ধ ও তেজস্বী মনোবৃত্তি, সাহিত্যের ইহাই মূল্যবান দান। বঙ্কিম-সাহিত্য এই দিক দিয়া তাহার প্রভাব বিস্তারিত করিয়াছে। বাংলায় তাহা যে নব সাগরণ, বঙ্কিম-প্রতিভাই তাহার প্রবর্তক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্য শাস্ত্র ফুৎকার দিবার বাংলায় আপনাকে চিনিবার, পাইবার, লাভ করিবার একটা সাদা পড়িয়া গিয়াছিল। এতটাই সঙ্গে জাগ্রত হইয়াছিল—বিজয়ী হইবার আকাঙ্ক্ষা। (ক্রমশঃ)

হিমালয়

“সম্পূর্ণ নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে—পর্বতেরই এই শক্তি আছে যে, মানুষের মধ্য হইতে তার শ্রেষ্ঠ বস্তুটুকু জোর করিয়া বাহির করিয়া লয়। মানুষ তার চরম চণিতার্থতা চাহে। কিন্তু হিমালয়ের কোনও শেখর অপেক্ষা আর বড় কিছুতে সচরাচর তাহা মনুষ্য-চরিত্র হইতে নিষ্কাশিত করিয়া লইতে পারে না—অর্থাৎ হিমালয়ই কেবল কোনও মানুষকে বাধ্য করিয়া দেহের পটুতা মনের সতর্কতা ও চিন্তের দৃঢ়তার শ্রেষ্ঠ অবস্থা আনিয়া দেয়। এ জগতই মানুষের প্রাণের টান এই পর্বতের দিকে—পর্বতও তাহাকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলে।”—ফ্রান্সিস ইয়ং-হাস্বেণ্ড।

প্রশ্নোত্তরী

প্রঃ। ষড়দর্শন কি কি ?

উঃ। ১। বৈশেষিক দর্শন। ইহা মহর্ষি কণাদ প্রণীত। মহর্ষি কণাদের প্রকৃত নাম উনুক সেজন্ত কেহ কেহ ইহাকে উনুক্য দর্শনও বলিয়া থাকে। ইহাতে পরমাণু নিত্য স্বীকার করে ও পরমাণু সমষ্টি দ্বারাই বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়। সকল পরমাণু সর্ব বিষয়ে সম-ধর্মযুক্ত নহে। পরমাণু প্রত্যক্ষ নহে অচুম্বেয়। এইমতে আত্মা জড়বিভূ। দেহ হইতে ভিন্ন। এইমতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই ছয়টি পদার্থ স্বীকৃত। কেহ কেহ অভাব সপ্তম বলিয়া থাকেন। এইমতে কারণ সং কার্য্য অসং। পরমাণু সং, তৎসমষ্টি সংযোগে সমুৎপন্ন পদার্থ অসং। সতোহসজ্জাত। মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে দুঃখের অভাব হয় তাহাই মুক্তি। কারণের অভাব হইলে কার্য্যের অভাব হয়। দ্রব্য নয়টি—পঞ্চভূত, দিক্ কাল, আত্মা ও মন। জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণ। জ্ঞান মনোগ্রাহ, বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ নহে। পঞ্চভূত বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ এতদ্ব্যতীত নহে। প্রত্যক্ষ ও অহুমান প্রমাণ। যার উৎপত্তি নাই তাহার বিনাশ নাই। দেহ সংযোগে আত্মার ভোগ হয়। তাই দেহ ভোগায়তন। ইন্দ্রিয় ভোগকরণ। আত্মা দুই প্রকার—পরমাণু বা ঈশ্বর ও জীবাণু। ঈশ্বর কর্তা ইহা অচুম্বেয়। জীবাণু আনি জ্ঞান এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ। প্রতি শরীরে ভিন্ন ইন্দ্রিয় জীবাণু। মনঃসংযোগে জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয় সংযোগে হয় না, তাই মন স্বীকার্য্য। মন বিভূ নহে অণু। তাই এক সময়ে এক ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয়। যে জ্ঞানের

জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সংযোগে জ্ঞানের উৎপত্তি দ্বিতীয় ক্রমে স্থিতি ও তৃতীয়ক্রমে তাহার বিনাশ হয়। রাবণ ও প্রশস্তপাদের ভাব

২। জায় দর্শন। ইহা মহর্ষি অক্ষপাদ গোতম প্রণীত। এতদ্ব্যতীত ইহাকে অক্ষপাদ দর্শনও বলিয়া থাকেন। ইহার অপর নাম আত্মীক্ষিকী। অণু ঈক্ষা অগ্নীক্ষা, পশ্চাৎ আত্মার মনন বা আলোচনা। জায় সাহায্যে অগ্নীক্ষা নির্বাহ হয় জ্ঞান নাম আত্মীক্ষিকী। ইহার অপর নাম তর্কশাস্ত্র। ইহাতে তর্ক পদার্থ বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে। বাক্যের শুদ্ধতাই যে এই শাস্ত্রের লক্ষ্য তাহা ষোড়শ পদার্থ নামেই বুঝা যায়, যথা—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেতুভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ। দেহাদিতে আত্মা নিশ্চয় করাই সমস্ত অনর্থের মূল। আত্মার সহিত মনঃসংযোগই মানস জ্ঞানের কারণ। আত্মা কর্তা ও ভোক্তা দেহ হইতে ভিন্ন। এইটী তত্ত্বজ্ঞান। পূর্বসংকীর্ণ ধর্মাদর্শ তত্ত্ব জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হয়। কাজেই পুনরায় আর দেহ পরিগ্রহ হয় না। তাই মুক্তি। ধর্মাদর্শ প্রবৃত্তিমূলক। প্রত্যক্ষ, অহুমান, উপমান ও আশ্রয় বাক্য এই প্রমাণচতুষ্টয়। ইন্দ্রিয়াদি আত্মা নহে। পরমাণুবাদ এই মতের স্বীকার্য্য। বাৎস্তায়নভাষ্য ও উদ্যোতকরের জায় বার্তিক উদয়নাচার্য্যের জায় বুদ্ধমাঞ্জলি, গঙ্গেশের চিন্তামণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কতিপয় শতাব্দী হইল বঙ্গদেশে নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর ভট্টাচার্য্য, মথুরানাথ, জগদীশ তর্কলঙ্কার প্রভৃতি (উহা নব্য জায় নামে প্রসিদ্ধ) জায় শাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন।

৩। সাংখ্যদর্শন। ইহা মহর্ষি কপিল প্রণীত। ইহাকে আদি কবি বলে। আত্মরি (কপিলশিষ্য) ও তৎ শিষ্য পঞ্চশিখ কৃত তত্ত্বসমাস, সাংখ্য প্রবচন, সাংখ্য সূত্র এই সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা প্রামাণিক সাংখ্যগ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হয়। 'ঈশ্বরাসিদ্ধে' সূত্র করায় কেহ কেহ ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য ও যোগকে স্বৈশ্বর সাংখ্য বলেন। সাংখ্যমতে আত্ম-ভোক্তা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ কর্তা নহে। প্রকৃতি সং তৎকার্য সং। সতোসজ্জায়ত। প্রকৃতি স্বল্পা সৃষ্টির কারণ বা কর্তা। এই মতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব জ্ঞান হইলেই মুক্তি। আত্মা অনন্ত। অব্যাক্ত। প্রকৃতি, মহৎ তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, ইন্দ্রিয় দশ ও মন এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় পাঁচ ও পঞ্চমহাভূত এই ২৪ তত্ত্ব। বাস্তবিক এক প্রকৃতিই তত্ত্ব অল্প সব প্রকৃতির বিকৃতি বা কার্য। প্রকৃতি হইতে দুষ্ক হইতে দধিবৎ পরিণতি। আত্মা লইয়া পঞ্চ বিংশতি সংখ্যক হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্ব। তাই ইহা দ্বৈতবাদ। এই মতে কার্যাকারণ হইতে ভিন্ন নহে। অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই। প্রকৃতি আত্মার ভোগার্থ ভোগ্য হন। আত্মা যখন প্রকৃতিকে জ্ঞানিতে পারেন তখন প্রকৃতি কুলধর হ্রায় আর সেই আত্মার সম্মুখে উপস্থিত হন না। তখন ঐ আত্মাকে মুক্ত বলা যায়। সর্বভূত এক অথও আত্মা স্বীকার করেন না। বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য ও গৌড়পাদের কারিকা সাংখ্য তত্ত্বকোমুদী (বাচস্পতি মিশ্র কৃত) প্রসিদ্ধ।

৪। যোগদর্শন। ইহা মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত। ইহাকে পাতঞ্জল দর্শনও বলে। ইহা সাংখ্য-স্মৃতির অনুযায়ী। ইহা সেধর এই পৃথক। এবং যোগের প্রাক্রিয়াদি ইহার মৌলিকতা। ব্যাস ভাষ্য ও ভট্টরাজের বৃত্তি প্রসিদ্ধ।

৫। পূর্বমীমাংসা দর্শন। ইহা মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত। ইহাকে কৰ্ম্ম মীমাংসা বলে। শুধু মীমাংসা বলিলেও ইহাকেই বুঝায়। ইহাতে একদশাধিক স্বপনের প্রমাণ করা হইয়াছে। বেদের কৰ্ম্মকাণ্ড বিহিত প্রণালীতে যজ্ঞানুষ্ঠানই কর্তব্য। ইহা সর্ববাদী মত হইলেও এই মতে অগ্ন্যাদি দর্শন মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং কুমারিলভট্ট ও প্রভৃতি এই পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের অভিপ্রায় দুই বিভিন্ন প্রণালীতে ব্যাখ্যা করায় ভাট্ট ও ভট্টাকরী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাট্টগণের শব্দভাবনাবিধি ও প্রভাকর শব্দের নিয়োগবিধি ব্যতীত তাত্ত্বিকগণ ষট্ঠাদান বিধির উপর জোর দিয়া তৃতীয় মত স্থাপন করেন।

৬। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন। ইহা মহর্ষি বাদরায়নি প্রণীত। ইহাকে উত্তর মীমাংসা, শারীরক সূত্র, বেদান্তসূত্রও বলে। ইহাতে এক অথও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। রজ্জুতে সর্প ভ্রমবৎ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম। ইহা প্রতিপাদ্য। ইহার উপর ভাষ্য করিয়া ভগবান শঙ্করাচার্য্য বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ইহা শ্রুতি অনুযায়ী। বেদান্তের উপবর্ষ বৃত্তিও প্রসিদ্ধ। অগ্ন্যাদি দর্শনে গৌরপাদের মাণ্ড্য কারিকা শ্রুতিবিরোধী মতও দৃষ্ট হয়। এই ষড়্দর্শন আন্তিক বাদ বলিয়াই গৃহীত হয়। গীতা ও ভাগবতে অদ্বৈতবাদ সুস্পষ্ট।

(ক্রমশঃ)

—স্বামী মহাদেবানন্দ

সন্মগতা

ত্রিযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বস্মৃতি)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

‘বার দুই কি তিন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল হইয়া তারপর বারে যখন থার্ড ডিভিজানের শেষপাতে নবীন কুমারের নামটা দেখা গেল, তখন তাহার বয়স কুড়ি বৎসর। সে আর ঐ সব করিবেই না বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিল এবং ইতিমধ্যে নানা রকম নভেল, নাটক, উপন্যাস পড়িয়া নিজের মনটিকেও একটি নভেলের নায়কের আকারে গড়িয়া ফেলিল।

নবীনকুমারের পিতা লক্ষ্মীকান্ত চন্দ্র কলিকাতার একটি হোসের মুৎসুখি, অর্থশালী লোক, কারবারও একটি ছিল। নবীন লক্ষ্মীবাবুর সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র, ইহার স্ববর্ণ-বীজক। নবীনকুমার দেখিতে সুপুরুষ এবং বলিষ্ঠ গঠন। নবীন বাল্যেই মাতৃহীন হওয়ায় পিতার কিছু বেশী প্রিয় পাইয়া একটু অবাধ্য হইয়া গিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে সে বড় গ্রাহ্যই কাণ্ডে না।

যখন কোনো ক্রমেই নবীন লুখা পড়ায় রাজী হইল না অপিচ কোনো কায কর্মেও লিপ্ত করা গেল না, তাহা হইলে তাহার নীতি অধিসরণ করিয়া তাহার একটি বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মীবাবুর ইচ্ছা ছিল যে, নবীন একটি একাধার বয়স্ক হয়, কিন্তু উপযুক্ত করণীয় ঘরে তেমন পাত্রী পাওয়া গেল না। কাষেই, যেটির সহিত পুত্রের বিবাহের ঠিক ঠাক করিলেন সেটির বয়স মাত্র একাদশ বর্ষ।

বিবাহের কথা যখন নবীনের কাণে পৌছিল তখন সে মনে মনে স্থির করিল,—‘এ বিবাহ সে করিবেই না!’ কৈশোর এবং যৌবন স্বপ্নের কাল। বাল্যের স্মৃতি অকস্মাৎ জাগৃতির মধ্যবর্তী কৈশোর এবং যৌবন, এ দুইটিই স্বপ্নময় জীবনাংশ। কৈশোরের নিষ্ক্রিয় স্বপ্ন, কিন্তু যৌবনের স্বপ্ন সক্রিয়। এই স্বপ্নময় কালের স্বপ্ন, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি অচুযায়ী, সকল মনেই অল্প বিস্তার আশ্রয় প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রবৃত্তি পূর্বজন্মকর্মজ। ব্যক্তিগত প্রকৃতি অচুসারে যে মন স্বতঃই ভাবপ্রবণ এই স্বপ্ন সে মনে সাম্রাজ্য স্থাপন করে এবং কখনো কখনো এই ভাব প্রবণতা যুবকে স্বপ্ন সাফল্যের পথে অপ্রতিহত বেগে টানিয়া লইয়া যায়,—কাহাকে গৌরবের অমরপুরে, কাহাকে বা রসাতলের অধস্তরে!

নবীনকুমার সবে মাত্র কৈশোরের সীমারেখা পার হইয়া যৌবনের মাটিতে পদার্পণ করিয়াছে। আলাউদ্দিনের প্রদীপের বলে জিন মুল্লকের বাদশাহী প্রাপ্তির আশা অবশ্যই সে আর করে না, এমন কি বর্ষে চন্দ্রে সজ্জিত হইয়া গড়মন্দারণ যাইবার আশাও সে রাখে না, তা’ বলিয়া বাগে বরাতে একটি আয়েষা তিলোত্তমা পাইবার আশা সে না করিবে কেন? কাজেই হঠাৎ পরের

পৌষ—১৩৩৯]

সমাগতা

১৫৩

মাতব্বরীতে একটা নেহাইং অচেনা, অজানা, হয়তো ঘ্যান্ধেনে, প্যান্‌পেনে, চেলি ঢাকা, নোলক নাকে বউ মঞ্জুর করিয়া লইতে তাহার মনটাকে সে কোন ক্রমেই রাজী করাইতে পারিল না। কিন্তু মনে তার যাই হউক, হট করিয়া বাপের সম্মুখে বলিয়া উঠিতে পারিল না যে,—আমি এ বিবাহ করিব না। কারণ, 'Father জন্ম দিয়েছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন বলেই ছেলের কাছে life long servitude দাবী কস্তে পারেন—This is an idea contrary to the policy of individual freedom!' এই যে কথাটা আজ কাল শুনি, এটা কলেজ এলাকার কথা, সৌভাগ্য বশতঃই হউক, আর দুর্ভাগ্য বশতঃই হউক, নবীন সে মাটিতে পদার্পণই করে নাই, তাই সে কথাটা সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিল না; ফলে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় হাতে যুতা বাঁধিয়া, মউর মাথায় দিয়া তাহাকে ছাওনা তলায় বসিতেই হইল এবং যথা কালে দ্বিজ-অগ্নি-শালগ্রাম সমক্ষে বলিতেও হইল—

‘অস্থিভিরস্থীনি, প্রাণৈশ্চেন্দ্রপ্রাণান,
মাংসদ্ব্যদৌর্ভূতং সন্দধামি!’

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

‘আরে ছ্যাঃ! ভেবেছিলাম ঠিক তাই?’

বিবাহের নবীনকুমার আড়ে আড়ে একাধিক সংখ্যক চোরা-চাইনি অপব্যয় করিয়াও নব বধূটির মুখখানি স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইল না। বাসর ঘরে যখন ঘর ভক্তি,—আত্মীয়া অনাত্মীয়া, ছোট, বড়, মাঝারি, সধবা, বিধবা, কুমারী, কালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, প্রাচীনা, গৌরাদী, শ্রামাদী, কাদী, দামিনী, কামিনী, কাননবাল, কুলদা, নিশাদা ইত্যাদি নানাবিধ নানাভাজীয় স্ত্রীলোক তাহাকে টোপা ঘেরা করিয়া মত্ত, অমাজ্জিত, অর্দ্ধমাজ্জিত, মেঠো, গ্রাম্য, নাগরিক নানানুতর ইয়ার্কি রসিকতায় নাটক টোবানি করিয়া তাহাকে দিশাহারা পথিকের গ্রায় আকুল, উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, আর সে তাহাদের গুরু চাপে পলে পলে রোজতাপে ছিন্ন শাখার মত ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছিল, সে সময় বধূটিও জড়পটুনি ইয়া বাসির ঘরের এক কোণে সর্বদেহ ঢাকা দিয়া নিঃশব্দে পড়িয়াছিল। যদিও কেই কেই দুই একবার সেই পুঁটুলিৎ পদার্থটিকে টানিয়া টুনিয়া নবীনের বামপার্শ্বে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কেহ কোনো ক্রমেই তাহাকে স্থির রাখিতে কিম্বা মুখ খুলাইতে সক্ষম হয় নাই। কায়েই সে রাত্রে আর নবীনের পত্নীমুখ দর্শন-সৌভাগ্য ঘটয়া উঠে নাই। তবে, তারই মধ্যে,—ঐ টোনাটানি ধস্তাধস্তির মাঝেই বধুর দেহের বর্ণটি দেখিয়া ফোভে অভিমানে নবীনের মনটি শতখণ্ডে এলাইয়া পড়িয়াছিল, তাই সে মনে মনে বলিল,—‘আরে ছ্যাঃ! যা’ ভেবেছিলাম ঠিক তাই?’ কিন্তু যা’-ই সে ভাবুক, সেটিকে একবার আপাদ মস্তক দেখিবার এবং দুই একটি কথা কহিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার ইচ্ছা সে কোন ক্রমেই দমন করিতে পারে নাই, তাই, পরদিন আপনার বাটীতে ফুল-শয্যা গৃহে যাইবার জন্ত নবীনকে বড় বেশী উপরোধ অল্পরোধ করিতে হইল না।

যথাকালে ফুল-শয্যা গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া নবীনকুমার দেখিল, সে দিনের সেই পুঁটুলিটি আজি পাশ বালিশের আকার গ্রহণ করিয়া আপাদ মস্তক কাপড়ে মুড়িয়া শয্যার এক প্রান্তে পাশ

বালিশের সঙ্গেই মিশিয়া আছে। নবীন মহা মুস্থিলে পড়িল। একবার বাহিরটা বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া, নবীনকুমার ঘরের খিল আঁটিয়া দিল এবং শয্যার এক পার্শ্বে গিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া উর্দ্ধমুখে ঘরের কট্রি বরেন্গা কয়খানা বার পাচ ছয় গণিয়া ফেলিল। তাহার মনটা কেমন এক রকম—একটা নূতন রকম হইয়া গিয়াছিল তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না, আর এইবার তাহার কর্তব্য কি তাহাও সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অনেক্ষণ এই ভাবে গেল। তুলার বালিশগুলির মত মাহুধবালিশটিও নড়ে না চড়ে না দেখিয়া নবীন স্যাবাস্থ করিল,—তাহার শিশু নাড়িকাটি ঘুমাইয়াছে; মনে করিল, তাহাকে জাগাইতে হইবে, কিন্তু কি করিয়া? নানা ধরিয়া ডাকিয়া? নামটি নবীন বিবাহের কালে জানিয়াছিল,—কিরণ বাল! নামটি নেহাৎই মন্দ নয়, চলন সহ বটে! ভাবিল,—নাম ধরিয়াই ডাকাডাকি করিব কি? অল্প ডাকেই সে যে জাগিবে তাহার কোনো লক্ষণই নবীন দেখিল না আর, বেশী ডাকাডাকি, চেঁচামেচি করিলে এখনি সবাই শুনিতে পাইবে কাবেই, সে কল্পনাও সে মনে আনিলা না; বিশেষতঃ যাহাকে কখনো ডাকে নাই,—ছোট হো'ক, বড় হো'ক মেয়ে ছেলে তো বটে! তাহার নামটা মুখে উচ্চারণ করিতে লজ্জাও আসিতছিল। নবীনের এক জ্ঞাতি কন্নার নাম 'কিরণ', সে তাহাকে সংহস্রবার 'কিরণ' 'কিরণ' করিয়া ডাকে তাহাতে তাহার কখনও কোন লজ্জাই হয় নাই, কিন্তু সেই বিশেষ সরগত নামটাও আর ঠোঁটে আসিয়া বাধিতেছিল, কাবেই, সে মনে করিল,—'ডাকাডাকির দরকার নাই, হাতে করিয়া ঠেলিয়া জাগাইয়া দিই, দেখি উঠিয়া কি করে! অহতঃ সেই সাবক'ণে চেহারাটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই!' ভাবিল,—'রংটি কালো, তা যদি হলুদ গায়ের ভ্রূরের মতই হয়, তখন না হয় 'কিরণ'বাল! নামটা ঘুচাইয়া ভ্রূর বলিয়াই ডাকা যাইবে!' তাহা হইতে একটা নেহাৎই অচেনা মেয়ে ছেলে এক ঠেলাঠেলিও তাহার মনে আসিল।

অবশেষে নবীন মনেমনে একটা কিছু ঠিক করিল; করিয়া, বার দুই চারি কাসিল, জোড়ে শব্দ করিয়া বিছানাটা বারিল, 'বুড়ো' করিয়া বসিল,—এঃ বিছানাটা পিপ্‌ড়ের ভরে গেছে যে!' কিন্তু কিরণবালার ঘুম ভাঙ্গিল না, তখন বালিশের ওপর এটা এখানে ওটা সেখানে করিয়া ধূপ ধাপ শব্দে ফেলিল, সরাইল, শব্দ করিল কিন্তু তাহাও কিছুই না। কিরণবালার গাট নিদ্রা ভাঙ্গার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না, তখন নবীন কুমার আস্তে আস্তে আলোটি তাহার মুখের নিকট লইয়া গিয়া দেখিল,—তিলাক ফাঁক নাই! তাহা নবীন আলোক রাখিয়া নবীন ধীরে ধীরে বধুর অবগুষ্ঠনটি খুলিয়া দিতে ইচ্ছা করিল। ঐ অবগুষ্ঠনের 'ভিতর' নিশ্চয়ই সেই গোবিন্দলালের তারই মত মুখট আছে, সে চুপিচুপি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে! এইবার আস্তে আস্তে সেই অবগুষ্ঠনো বস্ত্রাংশ ধরিয়া টান দিল। ও হরি! বিপরীত দিকে টান পড়ে যে! টানাটানিতে কাপড়টা যদিই বা একটু ফাঁক হয় তো তৎক্ষণাৎ সেটা ভটি হইয়া যায়; নবীন দেখিল,—জাগ্রত নিদ্রা! তখন সে তাহাকে টানিয়া-টুনিয়া একটু ঠাই-নড়া করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নববধু প্রাণপণ চেষ্টার দ্বারা অধিকার করিয়া রহিল, তিলমাত্র সরিল না। বান্দালী গৃহস্থের অপ্রগল্ভা একাদশ ববীয়া বালিকা,—ভয়ে লজ্জায় সে অাড়কাঠ হইয়া—'এহি মাম্‌ মধুসূদন!' ডাকিতেছিল। নবীন বালক-বুদ্ধিতে ধারণা করিল,—নষ্টামো! এইবার সে একটু বিরক্ত হইল এবং অকস্মাৎ বধুর মাথার বালিশটি ধরিয়া জোড়ে টান দিল। বহুটি এইবার একবার মাত্র 'উঃ উঃ' করিয়া নিঃশব্দে রোদন আরম্ভ করিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য নবীন আলোক নিকটে আনিয়া দেখিল,

পৌষ—১৩৩৯]

সমাগতা

১৫৫

বধুর মাথার কাপড় রক্তে ভিজিয়াছে,—বালিশের টানে মাকড়িতে কান কাটিয়া গিয়াছে, কি এমনি একটা কিছু ঘটয়াছে তাহা বেশ ঠাহরাইতে না পারিলেও তাহার মনে মনে লজ্জা হইল, ভয়ও হইল। সেই সময় আবার আপদের উপর আপদ,—বাহির হইতে কে বলিয়া উঠিল,—‘যেন গলায় বাধে না হে, কালকের জন্যে একটু রেখে।’ নবীন চমকিয়া উঠিল ও মনে করিল,—ও বাবা! ফুলশয্যা গৃহটি প্রকৃত পক্ষে নির্জন নয়?’ একষ্ঠম্বর তাহার জেষ্ঠ্যা ভাতৃভাগ্যার অগ্রজার!

নবীনকুমার নিরস্ত হইল। ক্ষুণ্ণ মনে খাট হইতে নাগিয়া মেঝের উপর একটা বালিশ লইয়া শুইয়া পড়িল। বধুটিও দুইবার সন্তর্পণে নাক বারিয়া, কয়েকবার খুসখাস্‌ বুনবান্‌ করিয়া নিস্তব্ধ হইল। নবীন দীপ নির্বাণ করিয়া দিয়া ভাবিল। এইবার সে তাহার মানস পটে কল্পনা তুলিকায় আঁকা কপালকুণ্ডলা, তিলোত্তমা, মৃণালিনীর পাশে তাহার পরিণীতা কাপড়ের মোড়কটিকে খাড়া করিয়া সেটিকে ছাই করিয়া ফেলিল। তখন ক্রোধ, অভিমান, হতাশা, বিরক্তি, লজ্জা এই সব সদলে আসিয়া তাহার সংস্কারাচ্ছন্ন মূর্তিতে মনটিকে টানিয়া তুলিয়া তাহার পিতার কার্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। স্থপ্তমন গজ্জিয়া উঠিল, অতিশয় বিরক্তির সহিত নবীনকুমার বলিয়া উঠিল,—‘খোং, তেরি!’

কিরপালা যথা নিয়মে পিত্রালয় গেল, শুশ্রূষালয় আসিল, আবার গেল আবার আসিল কিন্তু নবীন কুমার আর তার দ্বিসীমানা মাড়াইল না। পিতার আদেশ, ধর্মোদ্বিগ্নের অমুরোধ, শ্বশুরের তোষামোদ, সম্বন্ধীর অহনয় বিনয়, সবই তার জেদের মুখে, শ্রোতের তোড়ে কুটার মত, ভাসিয়া গেল। প্রত্যন্তরে নবীনকুমার বলিল,—‘শুশ্রূষাঘাট পাথরকুচা, আর মস্তুরগুলা বায়ুনের পয়সা নেবার ফন্দী!’

সকলদিন মধ্যেই নবীনকুমার খাট হইতে উঠিয়া বসিয়া বসিয়া নবান্নের সহোদরদিগকে কতকটা বাধা হইয়াই তাহার মন বোকাইয়া চলিতে হইল,—কি জানি, যদি এজমালি ঘরবাড়ী, বিষয় সম্পত্তি, কার-করার অংশ খেয়ালের মাথায় অন্যকে হস্তান্তর করিয়া ফেলে! তাহার সপরিবারে সার্বভৌমত্ব কলিকাতায় থাকিতেন। এই সকল স্থযোগে নবীনকুমারও বাড়ীতে বসিয়া আমোদ প্রমোদে মনোনিবেশ করিল। সে ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়াছিল, এইবার রোহিণী আহরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নাই।

যে প্রাসাদকক্ষ হইতে সঙ্গীত-লহরী ভাসিয়া আসিয়া সমাকে কাঁদাইল, সে কক্ষ নবীনের। সঙ্গীতকারী নবীনকুমার! সে স্বকণ্ঠ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাটা হইতে অপূর্ণ বালকবেশে সমা স্বাপ্পালোক বনপথ ধরিয়া সরাসর নবীনের কক্ষের পশ্চাৎভাগে উন্মুক্ত বাতায়ন সমিধানে আসিয়া বক্ষতলে ছায়াঙ্ককারে দাঁড়াইল। নবীন তখনও কতকগুলি বয়স্য সমভিষাযারে মজলিস করিয়া গান বাজনা করিতেছিল।

সমা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। ছোকড়ার দল একে একে চলিয়া গেলে নবীন একবার বাতায়ন সমিধানে আসিয়া দাঁড়াইল, সে সময় সমা কোনো ক্রমে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইল।

নবীন ডাকিল,—‘কে?’ সমা কোনো উত্তর দিল না। নবীন কক্ষ-হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমার নিকটবর্তী হইল। দেখিল, একটি বালক; বলিল,—‘কে হে ছোকড়া! আঁধারে দাঁড়িয়ে! মংলব কি, বল তো?’ সমা সে কথার কোনো প্রত্যুত্তর না দিয়া বিপরীত মুখে কাননাভাস্তুর-পথে যাইতে লাগিল, তদৃষ্টে নবীন সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব, অদূত-চরিত্র বালকের ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইল; মনে করিল,—‘পাগল নাকি? না, কি, লোকে যে ভূতের গল্প করে, এ সেই ভূত?’ মুহূর্ত্তের জ্ঞান নবীনের মনটি একটু দমিয়া গেল; কিন্তু সে স্বভাবতঃই দুঃসাহসিক। মুহূর্ত্তে আত্মসম্বৃত হইয়া মনে বল সঞ্চয় করিল। মনে মনে বলিল, ‘ভাল দেখাই যাক্ না!’ বলিয়া এক লম্ফে যাইয়া সমার একটি হাত চাপিয়া ধরিল। অতি কোমল হস্ত! বালকের হস্ত এত কোমল? সেই স্তিমিত অন্ধকারে নবীন তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিতে সমার মুখপানে চাহিল,—চিনিতে পারিল না। সমা হস্ত মুক্ত করিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া অচুচকণ্ঠে বলিল :—‘আসুন, বলি!’ স্বর অস্বাভাবিক কোমল! তখন সেই কাননাভাস্তুরস্থ ক্ষীণচন্দ্রালোক মিশ্রিত অন্ধকারের মত তাহার মনের ভিতর সন্দেহের অন্ধকারে আশার ক্ষীণালোক জড়াইয়া গেল। নবীনকুমার বসন্তাশিলচালিত কুহুম পরাগের মত সেই বালকরূপী সমার মুখ আহ্বানে নিঃশব্দে তাহার পশ্চাদ্বর্তী হইল। (ক্রমশঃ)

বীজ-পরিচয়

পিতা উদ্দালক পুত্র খেতকেতুকে নানা রকমেই বিশ্বের পরম হৃদয় করণ (‘‘অগিয়া’’) সং পদার্থের কথা বুঝাইতেছেন। নানা দৃষ্টান্ত দিতেছেন; নানা রকমের পরীক্ষা করাইতেছেন। একবার বলিলেন—‘‘গ্রোধ ফলমত আই—’’—এ বট গাছের একটা বীজ নিয়ে এস। ‘‘ইদং ভগবৎ—’’—এই যে উগ্ৰবন—’’—এই ভাঙ্গলাম। ‘‘কিমত পশুসিতি’’—ওর ভিতর কি দেখছ? ‘‘অথ ইবেমা ধানা ভগব’’—অগ্নির নিকট ছোট ছোট দানা, ভগবন। ‘‘আসামদৈকাং ভিক্টি’’—এ ছোট দানা আবার ভেঙ্গে ফেল। ‘‘ভিন্না ভগবৎ—’’—ভেঙ্গেছি ভগবন। ‘‘কি মত্র পশ্যসি’’—ওর ভেতরে কি দেখতে পাচ্ছ? ‘‘ন কিঞ্চ ভগব’’—কিছুই না, পুত্র।

তখন পিতা বলিলেন—তুমি ওর চাইতে হৃদয়তর দেখতে না পেলেও এটা জেনে রেখো যে, এ অণুবৎ হৃদয় সং পদার্থ হ’তেই এই প্রকাণ্ড বট গাছটা হয়েছে। আর এই অণুর ভেতরেই বট গাছটা হৃদয় ভাবে রয়েছে। এই বটের বীজের ভিতর যে হৃদয় সত্তাটির পরিচয় পাইলে, এ নিখিল বিশ্বের মর্ম্ম স্থলে সেই হৃদয় সত্তাই রহিয়াছে—এ হৃদয় সত্তাই সত্য, সেই সত্য আত্মা, আর সে আত্মা তুমি।

কোনো দেশ বিশেষের বা যুগ বিশেষের ইতিহাসকে খণ্ডিত ভাবে, ভাসা ভাসা ভাবে, বাহ্য অবস্থা পুঞ্জের দ্বারাই আক্লিষ্ট ভাবে, দেখিলে এ গাছের গোড়ার বন্দোবস্তটাই দেখা হইল না; স্বতরাং গাছের শাখা পল্লব গুলারও প্রকৃত তথ্য আমাদের পাওয়া হইল না। ডাল পাতার জীবনটা বুঝিতে হইলে বাইরের তাপ, আলোক, বাতাস, বৃষ্টি, হিম এ সবের হিসাব অবশ্য লইতে হয়; কিন্তু সব চাইতে ভাল করিয়া হিসাব লইতে হয় তার বীজনিষ্ঠ প্রকৃতিটির—যে ধর্ম্ম তাকে একটা বিশিষ্ট আকৃতিসম্পন্ন কতকগুলি বিশিষ্ট শক্তিতে সমন্বিত বটের বা অশথের ডাল পাতাই করিয়া দিয়াছে।

—শ্রীপ্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায়।

দশাবতার চরিত

বুদ্ধ-চরিত

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী

বৌদ্ধগণ শূন্যবাদী নামে অভিহিত

বৌদ্ধগণকে কেহ কেহ শূন্যবাদী ও পাষণ্ড-বলিয়া অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন ; আবার অনেকে অর্থাৎ জগতের বার আনা লোক বৌদ্ধধর্মের ভূয়শী প্রশংসা করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের ত্রায় অহিংসা ধর্মের উন্নতি অত্র কোন যুগে হইয়াছিল কি না তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না। বৌদ্ধধর্ম বৈদিক ধর্ম হইতে পৃথক ধর্ম বলিয়া মনে হয় না। বৈদিক ধর্মে যখন অত্যন্ত পশুবধ আরম্ভ হইয়াছিল তখনই তাহার প্রতিকার নিমিত্ত ভগবান বুদ্ধরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন।

বেদের নিষেধ বাক্য “গাং মা বধিষ্ঠাঃ” না মানিয়া লোকে অবাধে হস্তে পশু বলি দিয়া উদর পূর্ণ ও পৈশাচিক পিপাসা চরিতার্থ করিতেছে। যখন পশু-বলি পৃথিবীতে-শোণিততরঙ্গিনী প্রবাহিত হইতেছে সেই সময়ে ভগবান বুদ্ধদেবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যদুভিজ্ঞ—যিনি প্রকৃত বুদ্ধ হইলেন, যদুভিজ্ঞ বলে। যদুভিজ্ঞের লক্ষণ দিব্য-চক্ষুশোভা, পরচিত্তজ্ঞান, প্রজ্ঞা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, কামব্যাহাসাদি, এই ছয় বিষয়ে আভ্যন্তরীণ বুদ্ধের অত্যাশ্চর্য্য দশবল। পয়স্রব্যতানিধি এবং শূন্য সাঁহার বল স্বরূপ।

সিদ্ধার্থ বুদ্ধের উপদেশ চতুষ্টয়।

১। সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্। ২। সর্বং দুঃখং দুঃখম্। ৩। সর্বং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণম্।

৪। সর্বং শূন্যং শূন্যম্।

এই চারি বিষয়ের ভাবনার দ্বারা সাধক নিখিল বাসনা নিবৃত্তি করিয়া এক মাত্র শূন্য মনকে স্থাপন পূর্বক সমাধি লাভ করিয়া অন্তে নির্বাণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন। হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রেও এইরূপ প্রকারের বহু উক্তি এবং ধ্যান ধারণার বিধি আছে। নিম্নে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

তদন্তঃ শূন্যন্তং সকল স্তরগুরুঃ চিন্তয়েচ্ছাতিগুহম্।

ষট্চক্র।

বৌদ্ধবেদান্তের উক্তি—“যং সৎ তং শূন্যম্। যথা দীপ শিখা।” “প্রদীপের” শিখা প্রতিফলনে এক একটি উৎপন্ন এবং পরফলেই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট শিখা গুলি শূন্যে পর্যাবসিত হয়, শূন্যই সমস্ত সৎ বস্তুর আধার।

শূন্য শব্দের প্রকৃত অর্থজ্ঞান।—সাঁহার। বৌদ্ধধর্মে শূন্যবাদী বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, তাঁহার “শূন্য” শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃদয়দয় করিতে না পারায় অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ

করিয়া থাকেন। 'শূন্য' শব্দের ধাতুবিভক্তিগত অর্থ উপলব্ধি হইলে সমস্ত ভ্রম অপনোদিত হইবে। শূন্য শব্দের অর্থ স্ফীত। যাহা কারণে লীন ছিল, স্ফীত হইয়া এত বড় বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইল। শ্বি ধাতু কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ে গিদ্ধ। শ্বি ধাতুর অর্থ গতি ও বৃদ্ধি। যাহা হইতে গতির উদ্ভব হইয়া জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা শূন্যশব্দের অববোধক। শূন্য হইতে শূন্য শব্দ উৎপন্ন। শূন্য শব্দের বহু অর্থ আছে। ১ অভাব, অর্থাৎ বাল্য যৌবন বৃদ্ধ কোন ভাবই যাহার নাই। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, মানী, অমানী, সুস্থ, অসুস্থ ইত্যাদি কোন ভাবই যোগ্যে নাই; তিনিই শূন্য। তিনিই ভাবনাহীন। তাঁহার গতিতেই এই জগতের উৎপত্তি ও লয় হইতেছে। শূন্য শব্দের অন্যতম অর্থ আকাশ ও ব্যোম। ব্যোম যেরূপ ব্যাপক, পরমাত্মা বা মহাকালও সেই রূপ ব্যাপক। পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্কর প্রভু বলিয়াছেন—

জিৎসংসা বা পিপাসা বা শোকমোহো জরামৃতী।—(ভোজনেচ্ছা),
ন বিত্তস্তেহ শরীত্বাদ্ ব্যোমবদ্যাপিনো মম ॥

উপদেশ সাহস্রী। অঃ প্রঃ

এই যে শূন্যের কথা বলা হইল, যাহা বৌদ্ধ বেদান্তে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত, যাহা এই সাধারণ ভাবদ্যোতক শূন্য নহে। তাহা ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে বা অন্তরে বিদ্যমান। তাহার অস্তিত্ব ধারণ করা অতীব সূক্ষ্ম। হিন্দু শাস্ত্রেও তাহার আলোচনা হইয়াছে। এ ধ্যান ধারণার ব্যবস্থাও আছে।

সম্পদ শূন্যই ব্রহ্ম। শূন্যই একমাত্র ব্রহ্মের উপমাশূল। শূন্য হইতেই সমস্ত উদ্ভূত হইয়া শূন্যেই বিলীন হয়। শূন্যই সমস্ত সত্ত্বের আধার। বৈশেষিক দর্শন মতে নয়টি অধিক পদার্থ নাই। এই জগৎ সংখ্যার নয়টির অধিক নাই। কোন দেশে, কোন ভাষায় নয়টির অধিক সংখ্যা নাই। কোন সংখ্যার উপর শূন্য যোগ করিলে তাহার মূল্য দশ হয়। অতএব শূন্যের শক্তি অসীম। শূন্যের ধ্বংস নাই। শূন্যই সনাতন অর্থাৎ অনাদি কাল হইতেই এক ভাবে স্থিত, কোনকালে যাহার রূপান্তর হয় নাই এবং যাহা অসীম ও অনন্ত। দিক, কাল ও পরমাণু এই তিনটিই সনাতন বা অনন্তকাল স্থায়ী। সন্ ধাতু হইতে সনাতন পদ সিদ্ধ। সন্ ধাতুর অর্থ সন্নিভাগ ও দান। নিম্নোক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে সনাতন শব্দের অর্থ, বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হইবে।

সন্মানয়সি ভূতানি বপুষা যশসা শ্রিয়া।

পরেণ বপুষা দেব তস্মাক্ষাসি সনাতনঃ ॥

মৎস্য পুরাণ, ২৪৮ অঃ।

হে দেব! তুমি ভূতভগ্নাত্মক সকলকে শরীর, যশ এবং শ্রী দান করিয়া সম্মানিত কর, অর্থাৎ তোমার মানস পুত্র রূপে সৃষ্টি কর। সেই হেতু তুমি পরম আত্মা ও পরম দেহ দ্বারা অনাদি অনন্তকাল বিদ্যমান রহিয়াছ। কখনও তোমার ক্ষয় ও লয় নাই। সমস্ত জ্যোতিষ্মৎগণী সহ ব্রহ্মাদি তোমা হইতে উদ্ভূত হইতেছে এবং তোমাতেই লয় হইতেছে। কিন্তু তুমি সনাতন ও শূন্য রূপে এক ভাবে বিদ্যমান। তুমি আশ্রয়মধ্যবিহীন। তোমার প্রতিষ্ঠাতা কেহ নাই। শূন্য বা আকাশ হইতে শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি স্মরণ্য। শূন্য তাহার জনক বা জননী। শূন্যই ব্রহ্ম, শূন্য হইতেই সমস্ত ভাব পদার্থের উদ্ভব।

পৌষ—১৩৩৯]

দশাবতার চরিত

১৫৯

“অগ্নির্মহী গংগদুমরুং দিশশ্চ কালস্তথাহ্মা মনসীতি জগজ্জানানি।

যস্মাৎ ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজ্যামি ॥

—ব্রহ্মসংহিতা

তন্ত্রশাস্ত্রে মহেশ্বরের ধ্যানফল

ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে সংচিন্ত্য স্বপ্রতীকং যথোদিতম্। তমাবেশ্য মহচ্ছূত্রং চিন্তয়েদ্ বিরোধতঃ ॥

আত্মমধ্যান্তশূন্যন্তঃ কোটি সূর্য্য সমপ্রভম্। চন্দ্রকোটি প্রতিকাশমভ্যস্ত সিদ্ধিমাধুর্য়্যাত্ ॥

এতৎকালং সদাকুর্য্যাত্ অনালস্তং দিনে দিনে। তস্ত স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্কংসরাৎ নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥

ক্ষণাৎকঃ নিশ্চলং তত্র মনোযশ্চ ভবেদ্রবম্। স এব যোগী সন্ততঃ সর্বলোকেষু পূজিতঃ ॥

তস্ত কল্মষ-সংঘাতস্তৎক্ষণাদেব নশ্চতি। যং দৃষ্ট্বা ন প্রবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্তনিন ॥

—শিব সংহিতা।

পরিদৃষ্টমান ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে অর্থাৎ সোম ধারার উর্দ্ধে ও বহির্ভাগে আত্মার অব্যব যথাবিধি চিন্তা করত তাঁহাতে চিন্তা নিবেশ পূর্ব্বক মহেশ্বরের ধ্যান করিতে হইবে। ঐ শূন্য অনাদি, অনন্ত ও মধ্যশূন্য, উহা কোটি সূর্য্যবৎ প্রভাবিত এবং কোটিচন্দ্র সদৃশ স্বনিষ্ক জ্যোতি-বিশিষ্ট; উহার ধ্যানাভ্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। যে ব্যক্তি নিত্য আলস্ত ত্যাগ পূর্ব্বক এই মহেশ্বরের ধ্যান করবে নিশ্চয় একবর্ষ মধ্যে তাঁহার সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়। যিনি শূন্যধ্যানে ক্ষণাৎ সময় মনকে নিশ্চর রাখিতে সমর্থ হন, তিনিই প্রকৃত যোগী এবং ভগবন্ত, তিনি সমস্ত লোকেই পূজিত হয়েন। এবং তাঁহার পাপপুঞ্জ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ঐহার সাক্ষাৎকার হইলে মৃত্যু রূপ সংসার-পথে ভ্রমণ করিতে হয় না। অপিচ—উত্তরগীতায়

উর্দ্ধ শূন্যং অধঃ শূন্যং যদাত্মকম্। সর্বত্র স আত্মোতি সমাধিতম্ ॥ ১৮ ॥

শাস্ত্রাভাবতঃ শূন্যাপাটে: প্রমুচ্যতে ॥ ৩৪

ঐহার বুদ্ধিগণকে দায় ও নাস্তিক পদবী দ্বারা সম্ভাষণ করেন, উক্ত হিন্দু শাস্ত্রোক্ত উক্তি সকল কি তাঁহাদের দৃষ্ট অতিক্রম করিয়াছে?

যিনি অণুব পদার্থের স্বজন কর্তা, ঐহার জ্ঞানের সীমা নাই, শক্তির সীমা নাই, দিকের বা দেশের সীমা নাই, কাল-সীমা নাই, কল্যাণভাবের সীমা নাই, ঐহার আকার নাই, ঐহার রস নাই, যিনি ইন্দ্রিয়গণের অগোচর, সেই অভাব পদার্থই শূন্যনামে অভিহিত। অস্বকুলিতাবস্থা ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি ঐহাকে শূন্য বলিয়া ধারণা করেন, ব্রহ্মবিৎ বিজ্ঞেরা তাঁহাকেই পূর্ণ বলিয়া ধারণা করেন। সংক্ষেপে বলিতে হইলে ঐহাদের তুরীয় ভাবই শূন্য।

বৌদ্ধধর্ম্য বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্য।

বেদেরজ্ঞান কাণ্ড উপনিষৎ, সেই উপনিষদেই অহিংসা ধর্মের প্রচার ও ভূয়সী প্রশংসা লিপি বদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় উপনিষৎ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

বেদ ও বৌদ্ধধর্মের সৌসাদৃশ্য।—বৈদিক অর্থাৎ ত্রেতাযুগে মানবগণের মধ্যে দুইটি বিভাগ ছিল—আর্য্য ও অনার্য্য। শেষে অর্থাৎ দ্বাপরযুগারম্ভে গুণ কর্ম্মমুসারে আর্য্যগণের মধ্যে চারি বিভাগ প্রবর্তিত হইল;—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ঋগ্বেদে এই সকল শব্দের রূপান্তর ছিল। যথা—ব্রাহ্মণাসঃ, বিপ্রাসঃ, সোম্যাসঃ কিন্তু শূদ্রাসঃ শব্দ ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় না। তবে

মর্ত্যাস: (মর্তলোকবাসী) শব্দের প্রয়োগ আছে। দশম মণ্ডলের ২০ সূক্তে যে চারি বর্ণের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা পার্থিব মানবের জাতি বিভাগ সম্বন্ধে নহে। উক্ত সূক্তের ব্যাখ্যা তাহা “চতুর্বেদীয় পুরুষ সূক্তে” সপ্রমাণিত। যখন বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্য হইল তখন বহুবিধ উপাধিযুক্ত উক্ত চারি বর্ণ ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে বিद्यমান ছিল। বৌদ্ধধর্মের উত্থানকালে পুনরায় হিন্দু-মানবসমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। (১) ভিক্ষু বা শ্রমণ অর্থাৎ সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ; শ্রম ধাতুর অর্থ তপস্যা। যাহারা ভগবৎ আরাধনায় সর্বদা নিযুক্ত এবং সংসারত্যাগী, তাহাঁরাই শ্রমণ (শ্রমণ) নামে খ্যাত। ভিক্ষু শব্দ ভিক্ষু ধাতু হইতে উৎপন্ন, ভিক্ষু ধাতুর অর্থ প্রার্থনা ও ক্রেশ। কঠোর নিয়ম পালন করিয়া ঈশ্বরাদনা এবং জীবন রক্ষার্থে এক গৃহে যাহা পাইবেন তদ্বারা সেই দিন যাপন করিবেন। মুমুক্শু বাচক শব্দের অন্যতম নাম শ্রমণ। মুমুক্শু-বাচক শব্দের পর্যায়,—শ্রমণ, যতি, বাচস্পয়, ব্রতী, সাধু, অনগার, ঋষি, নিগ্রহ, ও ভিক্ষু। ইহাদের লক্ষ্য মোক্ষ বা অপবর্গ। বেদের জ্ঞানকাণ্ড—উপনিষৎ। উপনিষৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য ধর্ম গ্রন্থ। উপনিষৎ ধর্মের সহিত বুদ্ধ-ধর্মের সৌসাদৃশ্য আছে। (২) গৃহস্থ—যাহারা গৃহে বাস করিয়া ধর্মাম্বলারে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন।

অর্হৎ শব্দের দ্বারা আদি বুদ্ধের পরিচয়। বৌদ্ধগণের ব্যবহৃত বুদ্ধশব্দের পর্যায়,—স্বয়ম্ভু, শম্ভু, জগৎপ্রভু, ত্রিকালবিৎ, পরমেশ্বরী, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শিন, দেবাহিদেব, ক্রমোত্তম, আশু, বীতরাগ, তীর্থঙ্কর, তীর্থকর, জিন, জিনেশ্বর এবং অর্হৎ ইত্যাদি। এ সকল সংজ্ঞা একমাত্র ভগবানে প্রযুক্ত। সকল ধর্মেই দেখা যায় উপাশ্রয়ের বা জনকের নামানুসারে উপাসক বা সন্তানের উপাধি হইয়া থাকে। প্রকারান্তরে প্রথমে বুদ্ধগণ জ্ঞানগর্ভ অগ্নিদেবেরই উপাসক। সেই জন্য বৌদ্ধ উপাসক-গণের উপাধি বুদ্ধ শব্দের পর্যায় বুদ্ধ শব্দে রাখা হইতে ও হইয়া থাকে। জয়ধ্বনি বাচক জি ধাতু হইতে জিন শব্দ উৎপন্ন। জিন শব্দের অর্থ বুদ্ধ, অর্হৎ ও বিকৃত। ইন্দ্রিয় বা মন জয় করিতে পারেন তিনিই জিন উপাধি বাচ্য। তাহার মতাবলম্বী সাধক-সম্প্রদায় জৈন নামে খ্যাত। প্রথমে জৈন ও বুদ্ধে কোন প্রভেদ ছিল না। যিনি পূজার যোগ্য তিনিই অর্হৎ।

তীর্থঙ্কর শব্দের আদি অর্থ সপ্তব্রহ্ম; বেদের বৈখানর অগ্নি। তু ধাতু হইতে তীর্থঙ্কর শব্দ উৎপন্ন; তু ধাতুর অর্থ তরণ প্রবন। তীর্থ শব্দের অতীতম অর্থ উৎপত্তি স্থান। সোমধারা বা ছায়াপথই মন্দাকিনী নদী, বিশ্বের উৎপত্তি স্থান। ইহা বাঁহা হইতে উৎপন্ন তিনি তীর্থঙ্কর। বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্র প্রণেতাগণের উপাধিও তীর্থঙ্কর। যিনি যে বিষয়ে উপযুক্ত বা পারদর্শী তিনিই সেই বিষয়ের তীর্থ। তীর্থ অর্থে গুরুও হয়, যেমন সতীর্থ অর্থে গুরুভাই।

অর্হৎগণের ধ্বজা ও বাহনের নাম।—বৃষ, অশ্ব, গজ, প্রবগ, ক্রৌঞ্চ, অজ, শ্রীবৎস, শ্বেন, বজ্র, মৃগ, ঘট, কুর্শ, শঙ্খ, সিংহ ইত্যাদি। এই সকল নাম বেদ পুরাণাদিতেও গ্রন্থাদির নাম-রূপে ব্যবহৃত।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীত ও যোগ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

মার্গ সঙ্গীতের প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে হইলে এবং তাহার ফল প্রাপ্তির আশা করিতে হইলে শুদ্ধস্বর সমূহের সাধনা অতীব আবশ্যিক। শুদ্ধস্বর বীণা বা তবুরার যড়জ্ঞ তাঁর হইতে স্পষ্টভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। খরজ কথাতী যড়জ্ঞ কথার অপভ্রংশ মাত্র। শাস্ত্র বলেন “যট জায়ন্তে যন্তাং যড়জ্ঞ” অর্থাৎ যাহা হইতে ছয়টি স্বর উৎপন্ন হয় তাহাকে যড়জ্ঞ বলে। যড়জ্ঞ স্বরের (আর্য্য সঙ্গীতে) উচ্চতার নিদর্শন শাস্ত্রে নাই। সুতরাং সকল স্বর যড়জ্ঞ হইতে পারে, তবে নিম্নস্বরে ছয়টি স্বর সহজে শ্রবণ-প্রত্যক্ষ হয়। একশত বা তদপেক্ষা কম সংখ্যা কম্পনের স্বরে শুদ্ধস্বর সমূহ স্পষ্টভাবে শ্রবণ-প্রত্যক্ষ হয়। আচার্য্য হেল্ম হোল্ৎজ (Helmholtz) ৬৬ কম্পন বিশিষ্ট স্বরে অল্পরণাত্মক ধ্বনির (Harmonies of upper partials) কম্পন সংখ্যা গণনা করিয়াছেন। পিয়ানো বা হারমোনিয়াম যন্ত্রে শুদ্ধ স্বরগ্রাম নাই। ইহার কারণ এই যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীত কর্ড বা হারমনি প্রধান। এই, তিন বা ততোধিক বিভিন্ন স্বরের সমকালীন প্রকাশিত ধ্বনিকে কর্ড বা হারমনি বলে। এই কর্ডীয়ুক্ত গান বা বাজনা যাহাতে সহজ ভাবে জ্ঞাত হস্ত চালনায় বাজাইতে পারা যায় তাহারই জন্য উক্ত যন্ত্রাদিতে শুদ্ধ স্বরগ্রামকে রূপান্তরিত করিয়া (tempered scale) বিকৃত করা হইয়াছে। ইহার ফলে এক সপ্তকে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করা হইল এবং তদ্ব্যতীত এক একটি স্বর আর তিনটি স্বর যথা স, গ, প ; বা স, গ, প, নি ইত্যাদি সমান ক্ষমবিশিষ্ট হইয়া পড়িল। স্বরমাদের যড়জ্ঞের অল্পরণাত্মক ধ্বনি অর্থাৎ স্বরজ্ঞ বা প্রাতধ্বনি (echo) হইতে শুদ্ধ স্বর সমূহের বিকাশ হয়। কিন্তু যড়জ্ঞের অল্পরণনের সহিত হারমোনিয়াম প্রভৃতি বিকৃতস্বর (tempered scale) যন্ত্রের স্বর সমূহের মিল হয় না। তাহার কারণ Mr. Alexander Ellis (Translator of Helmholtz's "Sensation of Tones") স্পষ্টই বলিয়াছেন—“In point of fact, as he always hears tempered tones he never hears the exact commensurable ratios. In consequence of the impossibility of tuning with perfect exactness, the exact ratios are probably never heard.” প্রকৃতপক্ষে সর্বদা বিকৃত স্বরগ্রাম (tempered scale) শুনিবার হেতু তিনি যড়জ্ঞের অল্পরণাত্মক ধ্বনির (Harmonics) সাদৃশ শুদ্ধ স্বরগ্রাম সম্ভবতঃ কখন শ্রবণ করেন নাই।

ইহা হইতে শুদ্ধ স্বরের অজ্ঞতাই সূচিত হইতেছে। “স্বেতাঙ্গ ভায়া”দের সকল বিষয়ে প্রেক্ষাচারিতা—বর্ণবল, বর্ণসংযোগ অর্গাৎ বানান বল, উচ্চারণ বল, আর সঙ্গীতই বল, সকল বিষয়েই কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা অল্পসরণ করেন না। স্বেচ্ছাচারই সেখানকার নিয়ম। যথা, বর্ণমানার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন কঠ, তানু, জিহ্বা, ওষ্ঠাদি বর্ণনির্গম স্থানের কোন লক্ষ্য না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে পরিচারণ হইয়াছে। উপরন্তু f, h, l, m, n, q, r, s, y—ইহাদের ব্যঞ্জনবর্ণ বলে ধরা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার যুক্তবর্ণ যথা :— $a + f = f$; $a + i + c = h$; $a + l = l$; $a + n$

=m; এ+n=n; কি+উ=q; আ+র=r; এ+স=s; ইত্যাদি বর্ণ, বর্ণমালার অন্তর্গত হইয়াছে। স্বরবর্ণ মাত্র তিনটা a, e, o, এতদ্ভিন্ন i, u, কে স্বরবর্ণ বলা হইলেও প্রকৃত পক্ষে তারা স্বরবর্ণ নহে, ইহাদিগকে এক প্রকারে যুক্তস্বরবর্ণ বলা চলে, যথা—আ+ই=i; ই+উ=u.

বানান দেখিলে ও উচ্চারণ শুনিলে হাসি পায়, Put পুট, But বট, Should শুড, ইহাতে o এবং l বর্ণের কোন আবশ্যক ছিল না। আবার শুডে যখন “ei” যোগ করা যায়, তখন শুডার না হইয়া সোলডার হইল কেন? এ সকল যথেষ্টাচার ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? ইহাতে বৈজ্ঞানিক নিয়ম কোথায়? সঙ্গীতেরও এই দশা দেখিতে পাইবেন। এই উপলক্ষ্যে সাহিত্য সেবক মহোদয়গণের নিকট আমার একটি নিবেদন আছে, ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন। আমাদের বাদলা বানানে কোন দোষ না থাকিলেও উচ্চারণের কিছু দোষ আছে, যাহার জন্ত বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতগণের নিকট সময়ে সময়ে লজ্জা পাইতে হয়। তাহার সংস্কারের চেষ্টা সাহিত্য সেবকগণের বিশেষ বাঞ্ছনীয়; যথা:—ণ, য, ব, ষ, স এই বর্ণগুলি আগরা যথাযথ ভাবে উচ্চারণ করি না কিম্বা অভ্যাসবশে পারি না। আর কতকগুলি যুক্তাক্ষর যথা:—ক্ষ, জ্ব, জ্বা য হ হ, ইত্যাদিও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করি না। এতদ্ভিন্ন কথা এই যে বাদলা বলিার সময় ইংরাজী কথা অনেক ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা ত্যাগ করাও সাহিত্য-সেবকগণের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ বলেন যে অনেক সময় উপযুক্ত বাদলা কথার অভাবে ইংরাজী ব্যবহার করিতে হয়। হুঃখের বিষয় এই যে সকল ভাষার প্রসবিনী সংস্কৃত ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখি করাই এইরূপ অমূলক-হেতুবাদের কারণ।

যেচ্ছাচারি-বিরচিত হারমোনিয়ম যন্ত্রটিকে সর্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে, না হইলে মার্গ-সঙ্গীতের সিদ্ধিলাভের কোন আশা নাই। কেবল আড্ডা দেওয়াই সার হইবে। হারমোনিয়ম ব্যবহার বিষয়ে Rev. Popley সাহেবও বলিয়াছেন:—“The drum has come in recently to use harmonium for drone. This is undoubtedly convenient, but the noise is not by any means attractive, nor likely to add to the appreciation of Indian music by ears trained by quality as well as to pitch.” ভাবার্থ এই যে—সম্প্রতি সহিত হারমোনিয়ম সঙ্গতির প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় সুবিধাজনক, কিন্তু এই কোলাহল কোন মতে চিত্তাকর্ষক অথবা ভারত-সঙ্গীতের স্বস্বদর্শী শ্রুতগণের শ্রবণযোগ্য নহে। Convenient, noise, quality এবং Pitch এই কথাগুলির প্রতি পাঠক লক্ষ্য করিবেন। দুই বা ততোধিক রং ও তন্ত্রে ভাবে মিশিয়া যেমন একটা পৃথক রঙে পরিণত হয়, স্বর সেরূপ মিশিয়া যায় না। স্বর মিশিয়া যদি এক হইত তবে তাহা কণ্ঠে প্রকাশ-যোগ্য হইত। মিশিয়া যায় না বলিয়া, চেষ্টা করিলে মিলিত স্বরের মধ্যে এককালীন কেবল একটা মাত্র স্বর কণ্ঠে বাহির হইবে। একটা বাজানবর্ণে যদি দুই কি তিন স্বর যুক্ত করা যায়, যথা:—‘ক্লি’, কেহই তাহা এককালে উচ্চারণ করিতে পারিবে না। এ বিষয় আমি একটা প্রবন্ধ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসের ‘অমৃতমাজার পত্রিকা’য় লিখিয়াছি। তাহা পাঠে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে যাহারা সঙ্গীতে কৰ্ড ব্যবহার করেন তাঁহাদেরই জাতীয়-সঙ্গীতে ভুদ্ব্যনীয় বৈজ্ঞানিক আচার্য Helmholtz, সেই কৰ্ডেরই নিন্দা করিয়াছেন।

মার্গ-সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইলে শাস্ত্রমতে গুরুসমীপে তদুপা সাহায্যে স্বর সাধন করিবে। সাধনকালে যতক্ষণ একটি স্বর স্থিরভাবে রাখিতে পারা যায় ততক্ষণ একটি স্বরেই থাকিতে হইবে। উচ্চতার হ্রাস কিম্বা কম্পন আরম্ভ হইলে আর অগ্রসর না হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক পুনরায় আরম্ভ করিয়া সেই স্বর পুনঃ পুনঃ উক্তরূপে সাধন করিবে। এইরূপে বার বার কিছুকাল সাধনার ফলে স্বর শুদ্ধভাবে প্রকাশ পাইবে—স্থিতিস্থাপক হইয়া দীর্ঘস্থায়ী হইবে। ঋষিরা যে আয়তস্বরে প্রণবোচ্চারণ করিয়া থাকেন তাহা তাঁহাদের প্রাণায়াম শিক্ষার বিশেষ উপযোগী, সেইরূপ সঙ্গীতের স্বর-সাধনা। স্বর বিধি-বিহিত নিয়মে বার বার উচ্চারিত হইলে যোগের প্রাণায়াম, ট্রাটক, পেন্ড্রী ইত্যাদি সাধনা ও নানাবিধ আসন প্রক্রিয়া অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া দ্বারা মনের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা যে কারণে প্রাপ্ত হয় সঙ্গীতের স্বর, সাধনা করিলে ক্রমে সেই সব অবস্থা আসে। উপরে “আয়ত-স্বরে” প্রণবোচ্চারণের কথা বলা হইল। আয়ত-স্বর কি প্রকার তাহার জ্ঞান পুস্তক পাঠে হয় না; এই জন্ত শাস্ত্র বলেন, জ্ঞান গুরু-সাপেক্ষ। কোন জ্ঞান গুরু ভিন্ন হয় না।

ট্রাটক ও খেচরী যোগ-দৃষ্টি বিজ্ঞান বিশেষ, দৃকশক্তি বাড়াইবার জন্ত। স্বল্প বায়বীয়, অমানব-প্রাণী শ্বাসের জন্ত, চাক্ষুষ জ্যোতিঃকে স্বাধীন করিবার জন্ত, মিত্রা তন্দ্রাদি চাক্ষুষ দোষ বিনাশের এবং মনোবৃত্তির লয় জন্য ট্রাটক যোগ-সাধনার সোপান আছে। যথা—ইষ্টদেবে, নাসাগ্রে বা ক্রমধ্যে পলকান দৃষ্টি স্থাপন ততক্ষণের জন্য যতক্ষণ চক্ষুতে জল না আসে। এই ক্রিয়া সাধনের জন্ত দেবমূর্তি ও স্নানগ্রাম শিলা পূজার বিধি আছে। নাসিকাতে এবং ললাটে এই জন্ত তিলক ধারণ করিবার বিধি আছে। এত সকল বিধির উদ্দেশ্য নাসানায় বিগ্রহের পূজা করিয়াও কোন ফল পাই না। তিলক এখন মানের সাজ্জী (সেই ইয়া দাঁড়াইয়াছে)। এই সময়ে এই উচ্চতম বিচার এমন প্রাপ্ত হইয়াছিল যে গৃহে গৃহে স্নানলোকগণ এই বিচ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতেন। মহাভারতে এই বিষয়ে স্থলভানুমতী একটি রমণীর যোগ সিদ্ধির আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। তিনি নিজ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা রাজর্ষি জনকের বুদ্ধিমত্তায় (অন্তঃকরণ মধ্যে) প্রবেশ করিয়াছিলেন। যোগবিদ্যা যে প্রকারে অশুদ্ধ দৃষ্টি দেয় ও চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে, সেইরূপ সঙ্গীত ও মনোবৃত্তি লয় করিয়া দেয়।

বাহারী জয়জয়ন্তীর ঋষভের, গৌর সারঙ্গের গান্ধারের, কেদারবার মধ্যমের, কামোদের পঞ্চমের, হারীশ্বরের ধৈবতের, বেহাগের নিষাদের অনির্বচনীয় মনমাতানো ক্রিয়া অল্পস্বর করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সঙ্গীতে কি প্রকারে মনের লয় করে; উপরন্তু রাগ বিশেষের এমন সব স্বর-সমন্বয় অর্থাৎ প্রাকৃতিক কার্য্য কারণ প্রবাহ আছে যে সে সময়ে সংসার অনিত্য বলিয়া মনে হয়। এই ভাব আবার লোক বিশেষের বয়স ও প্রকৃতি বিশেষের উপর নির্ভর করে যথা—মনে করুন, একটি লোক ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল; সে স্থানে বালক, বৃদ্ধ ও যুবা উপস্থিত আছে। উক্ত ঘটনা দেখিয়া বালকের বিশ্বয় ভাব হইবে, বৃদ্ধের দয়ার ভাব আসিবে এবং যুবাব হাস্তভাব হইবে। যুবকটি যদি চিকিৎসক হন তাহা হইলে তিনি দয়া লুইয়া দোড়াইয়া লোকটাকে সাহায্য করিতে যাইবেন। আবার এই চিকিৎসকটি যদি অর্থপিপাসু অথবা গণ্যমান্য হন তাহা হইলে আহত লোকটির প্রতি দৃকপাতও করিবেন না।

তাহা বৃদ্ধিতে পাবিয়া ছুঃখ হয়। এই ছুঃখ সহ করিয়া যাহারা স্বরমিলনের চেষ্টা করে, স্বরসমন্বয় হইলে সেই মধুর মিলন স্বখে নিমগ্ন থাকে। অর্থাৎ এই অবস্থায় স্বরসমন্বয় কিছু কিছু হয় এবং বৃদ্ধিতে পারে।

যোগের একাগ্রতাবস্থায় চিত্ত কোন এক বাহ্যবস্ত বা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বনে নির্বাক্ত দীপশিখার ত্রায় নিশ্চল, নিরুদ্ধ বা অবিকম্পিত ভাবে বর্তমান থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি পরাভূত হইয়া কেবলমাত্র সাত্বিক বৃত্তি উদ্ভিত হয়—অর্থাৎ স্বথময় সাত্বিক বৃত্তিমাত্র অনুভব হইতে থাকে। সেইরূপ স্বরসাধক তদ্বারা অথবা আভ্যন্তরীণ স্বরাবলম্বনে নির্বাক্ত দীপশিখার ত্রায় অবিকম্পিতভাবে স্বরের একতা হয়। এইরূপ স্বর দীর্ঘস্থায়ী হইলে রজোস্তমোবৃত্তি নষ্ট হইয়া কেবল সাত্ত্বিকবৃত্তিমাত্র প্রবল থাকে। প্রথমে অসমাত্র স্থায়ী থাকে, সাধন করিতে করিতে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে এই একাগ্রতাই নিরুদ্ধাবস্থা আনয়ন করিয়া থাকে।

এই একাগ্রতাবস্থায় যজ্ঞের স্বয়ম্ভুসমূহ অর্থাৎ অগুরণাত্মক ধ্বনি শ্রবণ প্রত্যক্ষ হয়। প্রথমে তম্বুরার খরজের তার হইতে যে শুদ্ধ গান্ধার ও নিষাদ স্বরদ্বয় নির্গত হয় তাহা শুনিতে পায়, পরে সাধনাবাহুদ্বা ক্রমে সকল স্বরগুলি শুনিতে পায়। সাধনাক্রমে দূত ও স্থায়ী হইলে ২২টা শ্রুতির বোধও জন্মে। এই অবস্থা মার্গ-সঙ্গীত শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা; আবার যোগভ্রষ্টাবস্থার মত ইহাতেও ভীতি কিছু। যদি স্বরসাধক নিজে ইষ্টের প্রতি একাগ্রনিষ্ঠা রাখিতে পারেন তাহা হইলে মুক্তি নিশ্চিত, নতুবা পতন। এই পতন কি, পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। যোগের নিরুদ্ধাবস্থায় চিত্তের কোনরূপ অবলম্বন থাকে না, নিরাবলম্বনে থাকে। নিরুদ্ধাবস্থায় চিত্ত আপনকার কারণীভূত প্রকৃতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকে, কোন পরিবর্তন হয় না—যেমন আকাশ বা অথও দণ্ডায়মান কাগজ কোন পরিবর্তন হয় না; তদ্রূপে ত্রায় কেবলমাত্র স্বরসমন্বয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় আত্মার রূপ অজ্ঞাত থাকে। অজ্ঞান সময়ে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একীভূত থাকায় তাঁহার স্বর প্রচ্ছন্ন থাকে।

স্বরসাধকেরও তুল্যাবস্থা হয়। এই অবস্থায় স্বরসমূহ এক ঔকারে পরিণত হইয়া যোগ্য হইয়া যায়—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটি এক হইয়া মনের নিরাবলম্বন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাই অদ্বৈতাবস্থা, বা মুক্তাবস্থা, এই অবস্থায় দ্বৈতভাব থাকে না, বাক্যমনের অগোচর হইয়া বাক্যমাত্র থাকে। আত্মার অস্তিত্ব থাকায় দেহ বিকৃত হয় না; মৃতের ত্রায় নিপতিত ও পৃতিভাব প্রাপ্ত হয় না। বিদ্যুত ও অবিকৃত থাকে।

উক্ত পাঁচপ্রকার চিন্তাবস্থার মধ্যে প্রথম তিন অবস্থার সহিত যোগের অথবা মার্গ-সঙ্গীতের অল্পই সম্পর্ক আছে। গানে স্থখ আছে শুনিয়া বিক্ষিপ্তাবস্থায় কিছু স্থখসঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু সে স্থখ স্থায়ী হয় না। একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থায় যোগ এবং সঙ্গীত সিদ্ধ হয়।

দীর্ঘ চিন্তায় ক্ষুব্ধোদ্র নিবৃত্ত হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে যৎসামান্য চিন্তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তৎসঙ্গে তাহার শারীরিক অঙ্গচেষ্টা শিথিল, অবয়ব ক্লশ ও বিবর্ণ, দৃষ্টি স্থির ও বৈলক্ষণ্য-মুক্ত হয়, চিত্তও তখন অপেক্ষাকৃত তন্নয় হয়। শরীর যখন সামান্য চিন্তায় উক্তবিধ পরিণামের অধীন হইয়া পড়ে, তখন উৎকট চিন্তা বা প্রগাঢ় ধ্যানাবস্থায় শরীরের যে অবস্থা হয় তাহা মনস্তত্ত্ববিদ বা প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ যোগীরা বলিয়াছেন যে ধ্যান যদি অচ্ছেদ্য বা অনন্তরিতরূপে দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং

চিত্ত যদি ধোয় সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে তাহার শরীর তদাকার (ধোয় বস্ত্রবৎ) প্রাপ্ত হইবে। এই অবস্থাটী “তেলাপোকাকার ভয় জনিত কাচপোকাকার পরিণতিতে” বুঝা যায়। তেলাপোকাকার ভয়জনিত ধ্যানের ন্যায় কামজনিত, ঘেষজনিত এবং স্নেহ বা প্রীতিজনিত ধ্যান ও ধোয়স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ধ্যানে চিত্ত তন্ময় হয় এবং তন্ময় নিবন্ধন তাহাদের দেহও অনাথা হইয়া যায়। ভয়, কাম, ঘেষ ও স্নেহ প্রভৃতি যদি ঈশ্বরের প্রতি উৎকট বা প্রগাঢ় হইয়া পড়ে তাহা হইলে সে মোক্ষপদ পাইতে পারে। এই অভিপ্রায়েই ভাগবদ্ পুরাণে কামভাবে গোপীগণের, ভয়ে কংসের, ঘেষহেতু শিশুপাল প্রভৃতির মোক্ষ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। যে কোন ভাবেই হউক তন্ময়তাব হইলেই তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।

ভয়ে তেলাপোকা কাঁচাপোকাকার পরিণত হয়—এ কথা শুনিতে হয় ত কেহ কেহ হাসিবেন। তাহাদের চাপল্য ভঙ্গনার্থে ইংরাজী ইতিবৃত্ত উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। ইতিহাসটী ১২২০ সালের বৈশাখ মাসের “প্রবাহ” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।—

“জীবন্ত পাথরের মানুষ”

“প্রাণীগণের অস্থি কালে প্রস্তরীভূত হয়; ভূগর্ভে ইহার যথেষ্ট নিদান পাওয়া যায়! কিন্তু সজীব মানুষের অস্থি সমূহও প্রস্তরীভূত হয়—এ কথা অতি বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। ডাবলিন নগরের কোতুকাগারে (মিউজিয়মে) এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের প্রমাণ আছে। কর্ক নগরীর ক্লার্ক নামক এক ব্যক্তি সজীব অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছিল এবং সে অবস্থায় সে বহুদিন জীবিত ছিল। যাহারা ক্লার্ককে জানিত তাহারা সকলেই জানিয়াছে যে এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটবার পূর্বে ক্লার্ককে সকলে ক্ষিপ্তকারী ও বলবান ব্যক্তি জানিত। একরাত্রে কোনও কারণে তাহার চিত্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল; উত্থানকালে ক্লার্ক বুঝিতে পারিল তাহার শরীর কেমন অবশ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর ক্লার্ক চক্ষু চক্ষু ও অঙ্গাদি ব্যতীত সকলই প্রস্তর ভাবাপন্ন হইয়া গেল। সাহায্য বিনা আর উঠিতে বসিতে পারিত না এবং পরিশেষে দেহ আর কোন দিকে নত করিতেও পারিত না। দাঁড় করাইয়া দিলে ক্লার্ক সেই দাঁড় পায়িত, কিন্তু নড়িবার চেষ্টা করাও তার সাধ্যাতীত হইয়াছিল। তাহার দুইপাটী দাঁত জোড় লাগিয়া একখানা হইয়া গিয়াছিল। তরল খাদ্য তাহার উদরে চাপা হইয়া অতিপ্রায়ে দাঁত ভাঙ্গিয়া ফাঁক করা হইয়াছিল। তাহার রসনা স্বকার্য সাধনে অক্ষম হইয়া গিয়াছিল এবং কিছুদিন পূর্বে সে চক্ষুও দেখিতে পাইত না। ডাবলিনের কোতুকাগারে ক্লার্কের প্রস্তরীভূত দেহ সমস্তে রক্ষিত আছে।”

(ক্রমশঃ)

দিগ্‌দর্শন

বাঙ্গলার সমস্যা

বাঙ্গলা সম্বন্ধে এক সময়ে মহামতি গোথেল বলিয়াছিলেন—What Bengal is saying to day, India will be saying to-morrow, কিন্তু অল্পদিনের কথা, যখন ত্রার ফজলি হোসেন ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Assembly) বড় গলায় বলিয়াছেন—“That was said thirty years ago, that might have been true thirty years ago, but it is no where near the truth now.” শুধু ফজলি হোসেন সাহেব কেন, এখন অনেকের মুখেই এই ভাবের প্রতিক্ষণি শুনা যাইতেছে। বাঙ্গলার সমস্যা এক্ষণে নানাদিকেই যেন চিস্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যদি আমরা স্বল্পভাবে ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার আমরা পূর্বে ভারতবর্ষের তিনটি লোককে গণনার মধ্যে আনিতাম—এই তিন জনই বাঙ্গালী—রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র এবং প্রফুল্লচন্দ্র। এখনও তিনটি নাম ধরা হয় বটে, তন্মধ্যে একজন অবাদ্দালী—মহাত্মা গান্ধী, আর দুইজন বাঙ্গালী—রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র। কিন্তু এই দুই তিন জন বাঙ্গালীর পর আর কাহাকেও আন্তর্জাতিক হিসাবে গণনার মধ্যে আনা যাইতে পারে কি না এক্ষণে তাহাই ভাবিবার বিষয়। হয় ত পোহ কেহ বলিবেন বৈজ্ঞানিক ভ্রমতে বাঙ্গলা হইতে মেঘনাদ সাহা, নীলরত্ন ধর এবং জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহোদয়গণও প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের নাম নব্য যুগের বাঙ্গালীর মধ্য হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। বর্তমান গুরুগন বাঙ্গলা হইতে তাঁহাদের স্থায় বিশিষ্ট ব্যক্তি ক্রিয়ায় আছে বলিয়া মনে হয় না। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় হইতে এমন কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যাইতেছে না। রবীন্দ্রনাথের পর সেইরূপ সাংগিত্যিকের নাম শুনা যাইতেছে না। যদি বল, শরৎচন্দ্রের নাম সাহিত্যজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—কিন্তু শরৎচন্দ্রও তৌ অন্ত্যচল চূড়াবসী। তারপরে ‘তারপরের’ আর উত্তর মিলে না। এক্ষণে যে সব নব্য যুগের সাহিত্য পাওয়া যাইতেছে তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার যোগ্য জিনিস অল্পই পাওয়া যায়। এক্ষণে ‘রমেশদার আত্মজীবনী’র উপন্যাসের মাত্রাই যেন সাহিত্যের বাজারে চলি বেনী। এতদ্ব্যতীত সাহিত্যের ভাষায়ও যেন নূতন করিয়া ভাঙ্গন ধরিয়াছে। পূর্বে সাধুভাষ ও চলিত ভাষায় লেখা লইয়া মত্তভেদ চলিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে আর এক দিক্‌ দিয়া ভাষাকে বিকৃত করা হইতেছে। এতৎ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মালদহ হিন্দুসম্মিলনীতে বলিয়াছেন—“ভাষার মধ্যে অকারণ ও বিনা প্রয়োজনে কতকগুলি বিদেশী শব্দ ঢুকাইলে ভাষার ঐশ্বর্য্য বাড়ে না। সৌন্দর্য্য এবং নালিত্যও বৃদ্ধি পায় না। বাঙ্গলা ভাষায় স্বর্য্যবাচক রবি, ভানু, গিহির, ভাস্কর, প্রভাকর প্রভৃতি কত শব্দ প্রচলিত আছে। তাহার উপর মজব মাদ্রাসার বহিতে স্বর্য্যকে তাবু এবং আফতাব বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? বাঙ্গলা ‘শিশির’ সবাই বুঝে—শব্দটি সুপ্রাচ্য ও বটে। তথাপি মজব মাদ্রাসার বহিতে শিশিরকে মাবনাস ও ওন্ বলিতে হইবে। বাঙ্গলা ভাষার মধ্য দিয়া এখন উচ্চ হইতে উচ্চতর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সেই শিক্ষা হিন্দু মুসলমান উভয়কেই পাইতে

হইবে। তাহাদের সাহিত্যের একত্ব, ভাষার একত্ব এবং শিক্ষার একত্ব বাঞ্ছনীয়।” তবে ইহা শুভ লক্ষণ যে রামানন্দ বাবুর উক্তির প্রতিধ্বনি গত বড়দিনের সময় কলিকাতার অধিবেশনে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্বপে কবি কায়কোবাদ সাহেব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

“এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে মাতৃভাষার অনুলীলন ব্যতীত আমাদের জাতীয় জীবন সম্যকরূপে গঠিত ও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। বাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমানের জন্ত এক প্রকারের বাঙ্গলা ভাষা এবং বাঙ্গালী হিন্দুর জন্ত আর এক প্রকারের বাঙ্গলা ভাষার প্রচলন দেখিতে চান, আমি তাঁহাদের কেহ নহি। আমি বাঙ্গলার হিন্দু এবং বাঙ্গলার মুসলমানের জন্ত এক মিলিত ভাষা চাই। মুসলমানের স্বাভাবিক রক্ষার কোনই প্রয়োজন অল্পভব করি না। * * * আমার নিবেদন এই যে আমরা যেন বাঙ্গলা ভাষাকে অস্বাভাবিক না করিয়া তুলি। বাঙ্গলা সাহিত্যের বৃকে ইসলামী ছাপ ফুটাইয়া তুলিতে হইলে ভাবের দিক দিয়াই উহার বিকাশ করিতে হইবে। প্রচুর আরবী, ফার্সী শব্দের প্রচলন ঘারা তাহা সম্ভব হইবে না। * * * এই মাতৃভাষার ভাষা হইবে এক ও অখণ্ডিত। ইহাকে বাঁহারা খণ্ডিত করিতে চান আমি তাঁহাদের কচির ও দেশ-প্রেমের প্রশংসা করিতে পারি না। আমার ভরসা আছে, মাতৃভাষাকে দ্বিধা বিভক্ত না করিয়াও আমরা আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিব। উহা বজায় রাখাই আমাদের কাজ—ভাষাকে দ্বিধাভিত্তিক করা নয়।”

বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এক্ষণে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণের নাম ভারতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আই, সি, এস (I. C. S.) পরীক্ষায়ও বাঙ্গালী যেন পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে। লণ্ডনে বিগত আই, সি, এস পরীক্ষায় ২৫ জন ভারতবাসীর মধ্যে একজন মাত্র বাঙ্গালী পাশ করিয়াছে। এই সকল বিষয়ে মাদ্রাজীরা যেন বর্তমানে অগ্রবর্তী করিয়া মনে হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যও বাঙ্গালী অনেক পশ্চাতে—যদিও আজকাল বাঙ্গালার দৃষ্টি আদকে পাতত হইতেছে। বাঙ্গালার ব্যবসায় ক্ষেত্রে শ্রার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। বঙ্গদেশে বাঙ্গালী চালিত বঙ্গদেশ ফ্যাক্টরীর নাম এবং বঙ্গদেশী, চাকেন্দ্রী, মোহিনীগিল প্রভৃতির নাম শুনা যায় বটে, কিন্তু দেশ হিসাবে তাহাদের সংখ্যা নগণ্য বলিয়াই মনে হয়।

সমাজ-তত্ত্ব বিষয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ছায় লোক দেখা যায় না। যদিও এ ক্ষেত্রে বর্তমানে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের ছায় ছুই একটি লোকের নাম করা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক দিক দিয়া রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র হইতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার পর্যন্ত কয়েক জন ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখ যোগ্য এবং নব্যদিগের মধ্যে কুমার ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের নামও তৎসমপর্ধ্যায়ে রাখা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বিষয়ে ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য বটে। কিন্তু যতদূর বুঝা যাইতেছে সুযোগ ও অর্থের অভাবে অনেকের প্রতিভাই যেন মুগ্ধাইয়া যাইতেছে।

বাঙ্গলার বেকার সমস্যার কথা ভাবিয়া দেখিলেও বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়। বাঙ্গলা দেশে সহর ও মধ্যশ্রেণী আনুমানিক পনের লক্ষ লোক বেকার অবস্থায় আছে। ইহার কাজ পাইলে করে, ইহাদের কাজ করিবার সামর্থ্যও আছে, কিন্তু ইহার প্রাথমিক পয়সা পাওয়া না। তাহার কারণ বাঙ্গলায় অবাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। তাহার ব্যবসা ও

অধিক বিভাগ প্রায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। এই বাদ্দানী দেশে আবাদ্দানীর সংখ্যা আনুমানিক প্রায় পঁচিশ লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে ভারতের বাহিরে যাহাদের জন্ম এক্ষণে লোকের সংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজারের উপর হইবে। অতীত প্রদেশ হইতে যাহারা বাদ্দলায় আসিয়া উপার্জন করিতেছে তন্মধ্যে উড়িষ্যা ও বেহার প্রদেশজাত লোকের সংখ্যা প্রায় পনের লক্ষ হইবে। ইহাদের মধ্যে কার্যক্ষম লোকের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ ধরিলে এবং প্রত্যেকের বার্ষিক আয় গড়গড়ত তিন শত টাকা ধরিলে বাদ্দলা হইতে উড়িষ্যা ও বিহার বাসীরা প্রতিবৎসর ত্রিশ কোটি টাকা রোজগার করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া ১৯২১ সালের আদম শুমারীর বিবরণ মতে যুক্ত প্রদেশ জাত লোকসংখ্যার পরিমাণ প্রায় সারে তিন লক্ষ হইবে। ইহারা এদেশে প্রতি জন গড়ে বার্ষিক অন্ততঃ তিন শত টাকা উপার্জন করিলে এবং ইহাদের কার্যক্ষম লোকের সংখ্যা আড়াই লক্ষ ধরিলে উহারা এ দেশ হইতে সাড়ে সাত কোটি টাকা লইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আজমীর, মারোয়ার, রাজপুতনা-এজেন্সি, গোয়ালিয়র ষ্টেট ও দিল্লী হইতে ব্যবসার উপলক্ষে প্রায় লক্ষ লোক বাস করে। স্তরং ইহারা জন প্রতি গড়ে বার্ষিক হাজার টাকা রোজগার করিলে ইহারা এ দেশ হইতে বৎসরে দশ কোটি টাকা লইয়া যায়। ইহা ছাড়াও মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, পাঞ্জাব, বোম্বাই, চীন ও তিস্ত দেশের লোকসংখ্যাও এ দেশে আনুমানিক সওয়া লক্ষ হইবে। ইহারাও বাদ্দলার আসিয়া যথেষ্ট টাকা রোজগার করিতেছে। ভারতের বাহির হইতে যে সকল লোক ব্যবসা ও চাকুরী হিসাবে এ দেশে আসিয়াছে তাহাদের আয় যে পর্যাপ্ত তরিকায় সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত বর্কমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, রংপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় সাওতাল-পরগণা হইতে অনেক লোক আসিয়া চাষের কাজ, মাটির কাজ প্রভৃতি করিয়া থাকে। আসল কথা অল্প স্থানের ন্যে জীবিকা অর্জনের জন্ত বাদ্দানায় আসিতেছে আর বাদ্দলার লোক অনেক কাদ্দাল হইয়া গৃহছাড়া হইয়া বাসে করিয়া বেড়াইতেছে। বাস্তবিক যদি বাদ্দানীর মধ্যে একতা থাকে ও কার্যক্ষম লোক বাড়ে, তাহা হইলে বাদ্দলার বেকার সমস্যার পূরণ হইতে পারে। তাই বাদ্দলার লক্ষ্য চিন্তনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাদ্দলার দৈনিক অবস্থা অধিকতর আতঙ্কজনক। বাদ্দলার কয়েকটি বিশিষ্ট স্থান সম্বন্ধে অল্প স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির সংখ্যা অতীব বিরল। বাদ্দলার পল্লীর দিক দিক দিকে গমনে হয় বাদ্দলায় স্বাস্থ্যগন লোক শতকরা দুই জন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ৫০.৬০ বৎসর পূর্বে এ দেশের লোকের যে শারীরিক অবস্থা ছিল, আজ তাহার লেশমাত্র নাই। আজ বাদ্দানীর হতশ্রী পল্লীর অধিবাসিবৃন্দ নিরন্ন, জরাজীর্ণ। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত, মন্ডা প্রভৃতি উৎকট ব্যাধিতে বাদ্দলা দেশ বিধবস্ত। ইহার উপর জাতির প্রত্নতত্ত্বের মৃত্যুভয়ের ক্রমিক বৃদ্ধির কথা মনে হইলে ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯২৮ সালে প্রত্নতত্ত্বের মৃত্যু সংখ্যা আটগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কয়েক বৎসরে মৃত্যুসংখ্যা আরও অধিক হইবে বলিয়াই মনে হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামন দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্নতত্ত্বের মৃত্যু হারের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

সাল

মৃত্যুসংখ্যা

১৯২৩

১১৮৫

সাল	মৃত্যুসংখ্যা
১৯২৪	১৯৭২
১৯২৫	২৭৯০
১৯২৬	৩২২৮
১৯২৭	৪২২৫
১৯২৮	৭২২৬

১৯২৯ সালের স্বাস্থ্য বোর্ডের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে এ দেশে শিশু মৃত্যুর হার হাজার করা ১৭৯.৯। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগেও মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কলেরার মৃত্যু সংখ্যা চারিবৎসরে চতুর্গুণ বাড়িয়াছে, বসন্ত পাঁচ বৎসরে আটগুণের অধিক লোক সংহার করিয়াছে। যক্ষ্মা রোগে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চারিহাজারের অধিক লোক মরিয়াছিল, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ঐ রোগে ৯১৬৬ জন মরিয়াছে। আবার যক্ষ্মা রোগের মৃত্যুসংখ্যা যত, উহাতে প্রসিদ্ধিত রোগীর সংখ্যা তার দশগুণের কম নহে। বাদলা হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ১১৥ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বাদলায় সর্বসাকল্যে ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৩ শত লোক যমালয়ে গমন করিয়াছিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এই দেশ হইতে ১০ লক্ষ, ৯৪ হাজার ২ শত ৬৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। (১৯২৯ সালের স্বাস্থ্য বোর্ডের বিবরণ হইতে অবগত)। এই সকল ব্যাধির প্রবন্ধক কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া ডাক্তার বামনদাস মহাশয় বলিয়াছেন :—

- (ক) অনাহার।
- (খ) অর্ধাহার।
- (গ) অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস।
- (ঘ) অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম।
- (ঙ) দূষিততা।
- (চ) অর্থাভাব।
- (ছ) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ হইতে দেহক্ষয়।
- (জ) দূর স্থানে বহু পরিবার লইয়া বাস।

ইত্যাদি।

কিন্তু মনে হয় সকলের মূলে রহিয়াছে দারিদ্র্য। অর্থাভাব বশতঃই বাদলায় যে মূলক কার্যগুলি শীর্ণ হইয়া যাইতেছে তাহা সারজন্য এগুর্গণের ঢাকার বহুতা হইতেও বুঝা যায়—সম্প্রতি ঢাকায় সর্বজন সমক্ষে তিনি এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, পর্যাপ্ত রাজস্ব না হইলে বাদলায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কেবল যে নিষ্ফল হইবে তাহা নহে, পরন্তু অত্যন্ত অনর্থপাতের সহিত বিফল হইয়া যাইবে। লর্ড রোনাল্ডস্ মহোদয়ও একবার বলিয়াছিলেন যে বঙ্গীয় সরকারের তহবিলে অর্থাভাব বশতঃই জাতিগঠন মূলক কার্যগুলি করিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে রাজস্ব হিসাবে বাদলাই ভারত সরকারকে অল্প টাকা দেয়না। আর আব্দার রহিয়া ১৯২৮—২৯ খৃষ্টাব্দে যে হিসাব দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাদলা	১৬৥ কোটি টাকা
বোম্বাই	৫ কোটি ৮৪ লক্ষ

মাদ্রাজ	১ কোটি ৭৪ লক্ষ
যুক্তপ্রদেশ	৭ কোটি ১৬ লক্ষ
পঞ্চনদ প্রদেশ	৩ কোটি ৪৫ লক্ষ

সুতরাং দেখা গেল ভারতসরকারের রাজস্ব তহবিলে বাদলা অত্যাচার প্রদেশের তুলনায় অধিকতর অর্থ দিয়া থাকে। আয়কর বাবদও বাদলার দান অত্যাচার প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী :—

বাদলা	১৫ কোটি ১৬ লক্ষ
বোম্বাই	৩ কোটি ১৭ লক্ষ
মাদ্রাজ	১ কোটি ৩১ লক্ষ
যুক্তপ্রদেশ	১৯ লক্ষ
পঞ্চনদ প্রদেশ	৬১ লক্ষ

সুতরাং দেখা যাইতেছে রাজস্ব ও আয়কর প্রভৃতির দিয়াও বাদলা জাতিগঠন মূলক কার্যে বিশেষ কোন উপকার পাইতেছে না। সেই জন্ত আর আবদার রহিম রাজস্ব সচিবকে বলিয়াছেন— ‘বাদলা ভিক্ষা চাহি না, রাজস্ব বণ্টন সম্বন্ধে ত্রায়সদ্বত বিচার চাহে।’ অতএব দেখা যাইতেছে বঙ্গীয় সরকারের তহবিলে টাকার এই প্রকার টানাটানি থাকিলে বাদলায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা একটা বিরাট উপহাস হইয়া দাঁড়াইবে। এই জন্ত মিষ্টার বেঙ্কল ও মিষ্টার মর্গ্যান বলিয়াছেন আয়কর, পাটকর, করগেট, কাপড়ের শুক বাদলাকেই দেওয়া উচিত।

বর্তমান শিক্ষাও বাদলাজাতির উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষাপ্রণালীর ক্রটির দরুন বঙ্গীয়সমস্তা যেন প্রবল ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীন দেশের প্রদত্ত শিক্ষা তৎ-দেশের লোককে স্বাবলম্বী করে এবং স্বাধীন দেশের লোকেরা মনে করে যে, যে কোন উপায়ে সংগঠিত থাকিবে অর্থোপার্জন করিতে পারিবে। কিন্তু আমরা এদেশে যে শিক্ষা পাই তাহাতে দাস হইবার শিক্ষাই লাভ করা। এই দাসমূলভ শিক্ষার ফলে দাসত্ব ব্যতীত শিক্ষিত ব্যক্তির অত্র কোন উপায়েই রোজগারের সমর্থ্য থাকে না। কারণ শিক্ষার সঙ্গে এমন একটা অভিমান আসে যাহার বশত হইয়া আমরা কেবলমাত্র চাকুরীকেই ভদ্রবৃত্তি মনে করি। এই ধারণাই বাদলাীর সর্বনাশ সাধন করিতেছে। নচেৎ কলিকাতায় কত অ-বাদলা পথে পথে নানাবিধ জিনিস ফেরি করিয়া ও ছোট ছোট কান খুলিয়া স্বাধীনভাবে অর্থ-উপার্জন করিতেছে, আর বাদলা চাকুরি না পাইয়া ঘরত্যা পর্যন্ত করিতেছে। শারীরিক পরিশ্রমে যখন অর্থ-সমস্তার কতক সমাধান করা যায়, তখন চাকুরীর জন্ত কেবলমাত্র লালায়িত না হইয়া সংগঠিত থাকিয়া কায়িক পরিশ্রমে অর্থোপার্জনকে হেয় মনে করা বাদলাীর উচিত নহে—কোন স্বাধীন জাতিও তাহা হেয় মনে করে না।

এই ভীষণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জুটিয়াছে বিলাসিতা। অ-বাদলাীর মধ্যে বিলাসিতার মাত্রা ততটা বৃদ্ধি পায় নাই, তাই তাহারা স্বল্পব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। বঙ্গদেশে দারিদ্র্য যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, নগর শিক্ষিত নরনারীর মধ্যে বিলাসপরায়ণতা ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। গল্পী গৃহে গৃহে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়া কিন্তু নগরের নাট্যশালা বিচিত্র আলোকমালায় বিভূষিত। শিক্ষার সঙ্গে আসিয়াছে আবার স্বৈর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট সাহিত্য। চরিত্রের কথা দূরে থাকুক, এই প্রকৃতির সাহিত্য না আনিয়া দিতেছে দূরত্ব—না দিতেছে সংগ্রামে সমর্থতা। এই জীবনসংগ্রামের অসামর্থ্যবশতঃ

বাঙ্গালী আজ নিজ দেশে প্রবাসীর ন্যায় জীবনযাপন করিতেছে—বাঙ্গলা অবাস্তবিক স্থান হইয়া পড়িতেছে। ফলে বাঙ্গালীরা সর্বব্যাপারে কোণঠাশা হইয়া যাইতেছে।

আমাদের একভাষাভাষী বিন্দুর্ণ বঙ্গদেশের অঙ্গহানিও আমাদের কাছে অনেক কাজে বাধা উৎপাদন করিতেছে। সেই হিসাবেও আমাদের ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। সাধারণ যুক্তিতেও বুঝা যায়, যাহারা এক ভাষায় কথা কহে, যাহারা আচার ব্যবহারে এক নিয়মের অনুবর্তন করে, তাহাদের অধুষিত পরস্পর সংলগ্ন ভূভাগ লইয়া এক একটি রাজ্য গঠন করাই যুক্তি সম্মত ও দেশের পক্ষে কল্যাণকর। যুরোপেও এই নিয়মে এক একটি রাজ্য গঠিত করা হইয়াছে। এই ভাবে দেখিতে গেলে শ্রীহট্ট, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলের লোক-সকল ভাষায়, আচারে, ব্যবহারে, রীতি নীতিতে পূর্ণাঙ্গীয় বাঙ্গালী। আমাদের আসল অধিবাসী-দিগের সহিত তাহাদের ঐসকল বিষয়ে বিশেষ মিল নাই বলিয়াই মনে হয়। ইহাছাড়া গিংচুঙ্গ, মালভূম, ধলভূম প্রভৃতি বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। ঐসকল অঞ্চলের অধিবাসীরাও সর্ব বিষয়ে বাঙ্গালী। ঐসকল স্থানের ছাত্রেরা বাঙ্গালী-ভাষা অধ্যয়ন করে। ঐসকল অঞ্চলের বাঙ্গালীরা অবাস্তবিক সহিত বৈগতিক আদান প্রদান করে না। এই প্রকারে দীর্ঘকাল যাবৎ অন্য প্রদেশের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিতে দেখা হইয়া ঐসকল অঞ্চলের বাঙ্গালীরা কালক্রমে হয়ত তাহাদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া 'না ঘরকা না ঘাটকা' একটা কিস্ত-কিমাকার সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে। এই প্রকার অনৈসর্গিক ব্যবস্থায় বাঙ্গালী দীর্ঘকাল যাবৎ এক অস্বস্থ অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। গোলটেবিল বৈঠকে সিন্ধু ও উড়িষ্যার অঙ্গীকরণের কথা অনেকেই ভাবিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালার এই ন্যায়সম্মত দাবীর প্রস্তাবটি উত্থাপন করাও যেন সম্মত মনে করেন নাই। বাঙ্গালার অদৃষ্ট গদ্য, তাই তাহার পানে কেউ চোরেও দেখেন না, তাহার কথা কেহ ভাবিতেও চাহে না।

বাঙ্গলা আবার অতদিকে আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালী বলিতে বাঙ্গালার অধিবাসী-কেই বুঝায়—হিন্দুই হউক, খৃষ্টানই হউক, মুসলমানই হউক, বৌদ্ধই হউক বা নাস্তিকবাদী হউক—যাহারা কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গলায় বাস করিয়া আসিতেছে, তাহারা বাঙ্গালী নামে পরিচিত হইয়া অধিকারী। কিন্তু বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, আমাদের বাঙ্গলা দেশে কোন সম্প্রদায়, বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে তাহারা সূর ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়াছে। এই জন্ত তাহারা যেন আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে কতকটা সঙ্কোচ বোধ করে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তাহারা আপনাদিগকে একটি স্বতন্ত্র জাতি মনে করে এবং ইহার ফলে বাঙ্গলার রাজনীতি ক্ষেত্রে বিেষে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইরূপে নানা ভাবে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে জাতিতে জাতিতে বিেষের ফলে বাঙ্গালার শক্তির অপচয় হইতেছে এবং ঐক্যবদ্ধ হইবার পক্ষে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে।

বর্তমানে এলাহাবাদ এক্য সম্মেলনে যে বাঙ্গলার সমস্ত মৌমাংসিত হইয়াও হইতেছে না তাহার কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও মুসলমানদিগের জন্ত ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা ৫১ টি পদ ও সংখ্যালব্ধি হিন্দুর শতকরা ৪৪.৭ হইতেও প্রয়োজন বোধে তদপেক্ষা কম পদের প্রস্তাব। ইহাতেই বুঝা যায় সম্প্রদায়িক স্বার্থ-এদেশে কত প্রবল।

পূর্ব গগণের আলোকচ্ছটা দেখিয়া বিশ্বজগৎ যেমন জাগিয়া উঠে, বাদ্রনার দিকে চাহিয়া নব্যভারতও তেমনি নবজীবনে জাগিয়া উঠিতেছিল। শতাব্দী ধরিয়া নিখিল ভারতে দিয়াছিল সে স্বাদেশিকতার প্রেরণা, দিয়াছিল মনীষার দিব্য দীপ্তি, দিয়াছিল পথের সূচিদৃষ্ট নির্দেশ। জীবনের সর্বব্যাপারেই বাদ্রনা ছিল পথপ্রদর্শক। ডাক্তার জ্ঞানে এবং ডাক্তার মুখে সে দিনও বাদ্রনার বৃক দাঁড়াইয়া ঐ কথার বোষণা করিয়া গিয়াছেন। ‘গ্যান্‌টেষ্টার গাঙ্জেন’ এর সংবাদদাতা একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন—“কলিকাতা হইতে কেন্দ্রীয় শাসকের রাজধানী স্থানান্তরিত হইলেও কলিকাতা কিছুদিন যাবৎ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। অল্প প্রদেশে গোথেল ও তিলকের মত লোক জন্মিলেও, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রিক ব্যাপারে বাদ্রনা দেশ নেতৃত্ব করিতেছিল। * * * এক্ষণে কংগ্রেসে বাদ্রানীর প্রভাব লোপ পাইতেছে—পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল প্রদেশ ক্রমশঃ নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেছে,—মাদ্রাজও এ বিষয়ে উৎসাহশীল।”

উন্নত বাদ্রনার এবাধ অধঃপতনোন্মুখিতার কারণটি ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। দেখা যায় যেন বিগত মহাসমরের পর হইতেই অকস্মাৎ বাদ্রানীর একটা দীর্ঘতম অবসাদ আসিয়াছে। ত্রীযুক্ত বলাই দেবশর্মা মহাশয় এই অবসাদের কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া বাদ্রানীকে সম্বোধিত করিবার জন্ত যে একটা প্রবল গূঢ় প্রচেষ্টা চলিয়াছিল তাহা যেন সহসা সিদ্ধিলাভ করিল—নব্য বাদ্রনা হইয়া উঠিল প্রতীচ্যের দীন অল্পকরণ, তাহাও সংগ্রামের পরবর্তী যুরোপের—যে যুরোপের ভাঙ্গনা গিয়াছে। * * * আধুনিক বাদ্রনা মিশ্রিত বাদ্রনা। এই বাদ্রনার মনীষায় রঘুনন্দনের অবিগ্নিত বাদ্রানী নাই—নাই সীতারাম বা বারভূঞার নিজস্ব স্বাদেশিকতা। তবুও নব্য বাদ্রনার প্রথম বিকাশ আত্মনৃপ, আত্মদুঃখ, নিজস্বতার স্লাম্য পরিণীত। প্রথম জাগরণের উবাঞ্চলে দেখা দিলেন বিভাসাগর—অত্যাচার চরম পন্থী রাজনৈতিকও ততখানি তেজস্বী ও বীর্যবন্ত নহেন। আবির্ভূত হইলেন গিবেকানন্দ—প্রাচ্য যুরোপ ও আমেরিকার বৃকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ভাণ্ড-মহিনা অকুণ্ঠিত বোষণা করিলেন। বঙ্গ উদিত হইলেন—বিবস্বান স্বর্ষ্যের মত। তাঁহার চিত্তের আলোকে দিল বিশিষ্ট আত্মনৃপ্তি। এই যুগের শেষ দীপ্তি রবীন্দ্রনাথ—অপূর্ব গান গাহিয়া যখনবকে যুদ্ধ করলেন। বিজ্ঞান ও রসায়নের আচার্য্য—জগদীশ ও অক্ষুণ্ণ নিজস্ব প্রতিভাতেই উদ্ভাসিত। রাষ্ট্রনীতিতে অক্ষুণ্ণ এক একটা বজ্রবিলসন। * * * *

কিন্তু যুরোপীয় সময় শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্রনার প্রকৃতিতে একটা দৈন্ত দেখা দিল। সাহিত্যে নব্য বাদ্রনা আর নিজের কথা কহিতে পারিল না। প্রতীচির রিরংসা তাহাকে সংক্ষুব্ধ করিল। জ্ঞাতে জ্ঞাতে সে পাশ্চাত্যকেই সর্বোত্তমভাবে অনুকরণ করিল। রাষ্ট্রিক ব্যাপারেও তাহাই। হয়ত এ যুগের রাজনীতি অধিকার লাভের জন্ত অনেক কঠিন কথা কহিয়াছে, কিন্তু সেই চরম বক্তব্য বা উগ্র রাজনীতি তাহার চরিত্রের অন্তর্গত আদেশ নহে। আধুনিকনিগের বাদ্রনা চাহিয়াছে স্বরাজ। কিন্তু এই চাহিদার পেছনে রাখে নাই চারিত্রিক শক্তিমত্তা, রাখে নাই ত্যাগ ও তপস্বী—অরবিন্দ, উপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতিতে যাহা প্রদীপ্ত ও প্রভাবান্বিত ছিল।”

পরাক্রমের অত্যধিক বাসনাই বাদ্রানীকে অবনত করিয়াছে, তাহার নিজস্বতার বিনোদ সাধন করিয়াছে। এই নিজস্বতার লোপেই বাদ্রনা শক্তিহীন হইয়াছে ও তাহাতেই তাহার বর্তমান অধঃপতন। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতি যদি বাদ্রানীর আত্মার প্রতিচ্ছবি হয়, যদি তাহা

বান্দলার স্বাধিষ্ঠান ভূমি হইতে চ্যুত না হয়, যদি তাহাতে জাগ্রৎ প্রাণ, চরিত্রবত্তা, তপস্যা ও ত্যাগ থাকে, তবেই বান্দলা আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা হইবে। মহাত্মাজীর রাজনীতিক মতবাদে হয়ত বিশেষ নূতনত্ব নাই, কিন্তু তাঁহার ত্যাগ ও তপস্যার জন্তই তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বপদ অধিগত হইয়াছে। বান্দলার ভাইদিগকে এইদিক দিয়া একটু ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। অলং বহু প্রপঞ্চেন ইতি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যুক্তির চক্ষে ভারতীয় অস্পৃশ্যতা

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, বি-এস-সি (লণ্ডন)

অস্পৃশ্যতা জগতের সর্বত্র কোনও না কোনও প্রকারে চিরকাল বিদ্যমান আছে। কারণ ইহার মূল প্রকৃতির একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়মে দৃঢ় বন্ধ—তাহা পার্থক্য বা ভেদবিধি। তবু ভারতে অস্পৃশ্যতা যে ভাবে বর্তমান, তাহা আমেরিকা, আফ্রিকা ও পলিনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে বিদ্যমান অস্পৃশ্যতার হায় তত নিষ্ঠুর অমানুষিকতাব্যঞ্জক নহে। বিনা বিবেচনার সর্বসাধারণের প্রহারভোগী করিয়া যে বর্ণবিদ্বেষী লিঞ্চিং নামক দণ্ডবিধান, তাহা ভারতে অপরিচিত। অন্য দেশে এই বর্ণবিদ্বেষের ভীষণ কাহিনী শুনা গিয়াছে—১৯২০ খৃঃ অব্দে আমেরিকাতে ২ জন নিগ্রোকে এই লিঞ্চিং প্রথায় জীবন হারাইতে হয়, তার মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও ছিল। ইহাদের মধ্যে বত্রিশ জনকে ফাঁসিতে লটকাইয়া দিয়া মারিয়াছিল, পনের জনকে গুলি করা হয়, তের জনকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়া মারা হয়, দুই জনকে ডুবাইয়া দেওয়া হয়, এক জনের বেত্রাঘাতে প্রাণ বিনাশ করা হয়, অবশেষ সকলকে অজ্ঞাত নানা প্রকারে মারিয়া ফেলে। ন্যাশনাল ফল ফ্রুট 'বিজয়ের ফল' (Fruits of Victory পৃষ্ঠ ১৫৭) নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার এই প্রকার একজন নিগ্রোকে একটা কাষ্ঠ দণ্ডে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বাঁধিয়া জীবন্ত আগুনে পুড়াইয়া মারা হইতেছিল; আর সেই হতভাগ্যের ধীর অগ্নিসংযোগে জীবনঅবসান। ষোল্ল শতাব্দিক লোক চতুর্দিকে দাড়াইয়া ইহার দর্শনসুখ উপভোগ করিতেছিল। গীলবার্ট মুরে বলিতেছেন—“কেহ যেন কল্পনার এই ভ্রান্ত ধারণা লইয়া না থাকেন যে,—কেবল মাত্র জর্মান ভক্তার পীটারস্‌ই তার উপপদ্ধিকে মারিতে মারিতে প্রাণ শেষ করিতে পারেন, অথবা নব-হিব্রাইডিসের করাসী প্রহুরাই চিমটা দিয়া তাহাদের হৃদয়দের পৃষ্ঠের চামড়া তুলিয়া দিতে সক্ষম, আর আমাদের নিজ (ইংরেজী) সংবাদপত্র গুলি হয়ত ট্রান্সভাল ও কঙ্গো—ফ্রী-ষ্টেটের ভ্রাসের সংবাদে উল্লাস দেখাইতে পারে,—কিন্তু ইংরেজ, স্কটল্যান্ডবাসী ও আয়ারল্যান্ডের লোকেরা একরূপ কিছু করিতে পারেন না। কৃষ্ণাঙ্গী নারীদের লইয়া ইহারা যে অদ্ভুত অপ্রীতিকর ব্যবহার করেন, সে কথা বলিব না। আমি স্বয়ং একজন লোককে বিশেষ করিয়া জানি যিনি দৃষ্টিমাত্র গুলি করিয়া কৃষ্ণাঙ্গদের জীবন সংহার করিতেন। আর একজন লোকের সাক্ষাৎকার আমার ঘটিয়াছে,

যিনি গর্বের সহিত কহিয়া বেড়াইতেন যে, তিনি ঐরূপ নিগ্রো নিবাসের কাছে রাস্তার উপরে বিষ-মিশ্রিত খাণ্ড রাখিয়া দিতেন, যাহাতে তাহারা তাহা খাইয়া ইন্দুরের মতনই মরিয়া যাইত এবং তাহাতে এক আপদ চুকিত। আমার ভ্রাতা কুইনল্যাণ্ডের এক ভ্রাতৃলোকের অতিথি হইয়াছিলেন; তিনি তাহাকে একটা নদীর বঁক দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, সেখানে একদল কুমীরের মুখে একবার কৌতুক করিয়াই সমগ্র একটা নিগ্রো পরিবারের পুরুষ, স্ত্রী ও সন্তানগণকে জোড় করিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাদের জীবন শেষ করিয়াছিলেন। আমার পিতা আমার নিকট বলিয়াছেন যে, পূর্বে নিউ-সাউথ-ওয়েলস্ এর খেতকার ব্যক্তিরা তত্রত্য কৃষিকায় নিগ্রোদের বাড়ীতে নিগমণ করিয়া আনিয়া বিষ-মিশ্রিত খাণ্ড খাইতে দিত; সে সকল লোকদিগের শাস্তি বিধানের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যখন এই সকল বিষয় লিখিয়া রাখি, তখন পার্থ হইতে প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্র পাই, তাহাতে কয়েকজন কুলগাডিয়াপ্রবাসী খনির কর্মচারীর এক মোকদ্দমার বিবরণ দেখি, ইহারা একজন কৃষিকায় নিগ্রো স্ত্রীলোক ও একটা বালককে এক মোটা কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা মারিতে মারিতে জীবন শেষ করিয়াছিল; তাহাদের অপরাধ যে তাহারা ইহাঙ্গিকে রাস্তা দেখাইয়া দিতে পারে নাই। ইহাদের মৃতদেহ গলদেশ সংলগ্ন অস্থি-সহ খণ্ড খণ্ড বিভক্ত দেখা গিয়াছিল; বিচারকগণ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এরূপ ঘটনা অহরহই ঘটিত। এরূপ দীর্ঘ দূর্ব্যবহার যে বিরল বা কোনও বিশেষ দুশ্চরিত্রপরায়ণ লোকেরাই করিয়া থাকে তাহা নহে। এই বৃত্তান্তে যাহাদের কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে দুইজন লোককে জানি, তাহারা ভাল লোকই ছিলেন, মন্দ নহে। আর যে সকল অত্যাচারের কথা বলা হইল, তাহা অপেক্ষাও গুরুতর অত্যাচার হইয়া থাকে।” *

ভারতে অস্পৃশ্যতা মূলতঃ অনেকটা স্বাস্থ্য-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক কারণেই উদ্ভূত হয়; বর্তমান সময়ে ইহার কোনও অংশই স্থায়ী না; যুক্তি তাহার কিছু নাই। এতকাল যে ইহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে অবশ্যই ইহা বুঝিতে হইবে না যে, ইহা একান্তই দোষের অথবা ইহাতে কেবল বিদ্রোহ বা উৎপীড়নের ভাবই বলবৎ—নব্য ভারতের লোকের নিকট অবশ্য এরূপই বোধ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তরূপে আমার নিজের কথাই বলিতেছি—কিছুদিন পূর্বে আমার নিজের এক বিধবা ভগ্নী আমার নিকট ছিলেন। যদিও আমার পান ভোজন ও সাধারণ জীবন প্রণালী এখনো অত্যন্ত গোঁড়া কোনও হিন্দুরও তাহাতে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না, তবু আমি যে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে বিলাত গমন করিয়াছিলাম, এবং তজ্জন্ত এখনও প্রায়শ্চিত্ত করি নাই, সেজন্ত যে দোষ এখনও আমাতে লাগিয়া রহিয়াছে, এবং আমার ভগ্নিনীর কাছে আমি অস্পৃশ্যের ন্যায় ব্যবহার পাইতাম। আমি তাহার রন্ধনশালাতে প্রবেশ করতে পারতাম না; আর তিনি আমার হাতে কোনও খাণ্ড বা পানীয় গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু সেজন্য যে আমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বা ভালবাসার কিছু মাত্র হ্রাস পাইয়াছিল, তাহা নহে। হিন্দুদিগের মধ্যে কোনও পরিবারে কাহারও মৃত্যু হইলে, সে পরিবারে সকল লোকই কতক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অস্পৃশ্য হইয়া থাকে। আবার দেখা যায় অস্পৃশ্যদিগের মধ্যেও অস্পৃশ্য রহিয়াছে। একজন চামার মাহারের কাছে অস্পৃশ্য, ভাদ্রী বা মেঘব এইরূপ পরম্পর অস্পৃশ্য। কিন্তু এজন্য যে তাহা-

* Liberalism and the Empire—pp. 153-54.

দের মধ্যে কোনও বিদ্বেষ ভাব আছে, তাহা নহে। দক্ষিণ ভারতের পারিয়াদের সম্বন্ধে যে এত কথা শুনা যায়, তাহাদের প্রতি ব্যবহারেও বিশেষ সহৃদয়তা দেখা গিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে আর শ্রীযুত শঙ্কর নায়ার বর্ণিয়াছিলেন যে, “ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের শাসনাধীনে ইহাদের অবস্থার কোনওরূপ উন্নতি হইয়াছে, ইহা যাহারা বলে, তাহারা বিমূঢ়; বরং ইহারা ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর অবস্থায়ই উপনীত হইতেছে! দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়াই তাহা দেখান যাইতে পারে। এদেশের প্রাচীন প্রথাতে ইহাদের বিনা খাজনায় বসতি স্থান দেওয়া হইত, কুটার নির্মাণের উপাদান সমূহ বিনা খরচে জঙ্গল হইতে পাইত, পশুচারণ-ভূমি বিনা বায়ে পাইত, এবং তাহারা যে জমি কর্ষণ করিত, তাহার উৎপন্ন শস্তের একটা নির্দিষ্ট অংশ পাইত, তাহাতেই তাহাদের ভরণ পোষণ চলিত। বর্তমান ‘রাইয়তদারী’ পদ্ধতিতে এ সমুদয়ই তাদের চলিয়া গিয়াছে।” ইহা আনার স্মৃতিপথে বেশই গড়ে যে এক সময় দেখিয়াছি বখন এদেশে কেবল যে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই মৈত্রীর ভাব বিরাজ করিত তাহা নহে, সকল শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেও পরম একতা ছিল। তখনও সাম্প্রদায়িক সমস্যা এদেশে উদয় হয় নাই। এই একতা বা মিলের আংশিক কারণ ছিল—কর্মবাদে বিশ্বাস; তাহাতে লোকে স্ব স্ব অদৃষ্টফলে সন্তুষ্ট থাকিত, আর ইহা আর এক কারণ ছিল—হিন্দুদিগের মধ্যে অসাধারণ বিশ্বপ্রেমিকতার প্রসার লাভ। এই অল্পকাল পূর্ব পর্য্যন্তও অবস্থাপন্ন হিন্দুরা নিজ ভোগবিলাসে খুব কমই খরচ করিত; তাহাদের সঞ্চয়ে অধিকাংশই মন্দির নির্মাণ, পুস্তকপ্রতিষ্ঠান, ইন্দ্রা ও পান্থনিবাসাদি সর্বসাধারণের উপকারজনক কাজে লাগাইত। হিন্দুর বাটা ছিল একটা ক্ষুদ্রাকারের ভোজনালয়, যেখানে সকল প্রকার লোকেই আহার ও বাস-স্থান মিলিত। এতদ্ প্রসঙ্গে এবী ভূবয় হিন্দুদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য—“কোনও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ভিক্ষার্থী হইয়া কিছু না পাইয়া চলিয়া যাইবে, হিন্দুর প্রাণ তাহা সহ করিতে পারে না। কোনও একজন ইউরোপীয়ের যাহা আছে, তাহা সে সম্পূর্ণ নিজের জন্তই রাখে; কোনও হিন্দুর যাহা আছে, তাহা সে সর্বদাই যাহার কিছু নাই তাহাকে দিবার জন্য প্রস্তুত; বস্তুতঃ একথা বলা চলে যে, একজন ধনাঢ্য হিন্দু মনে করে—সে তাহার ধনের ন্যাসী বা বণ্টনকারী মাত্র, কখনও স্বত্বাধিকারী নহে—দান ও বদান্যতার কার্য্যে সে এত অধিকই ত্যাগ করে।

হিন্দুদিগের ধর্মগ্রন্থ সমূহ নানা উপদেশবাক্যে পরিপূর্ণ। গৌতম বুদ্ধের সহুপদেশ তার দৃষ্টান্ত। তিনি জোরের সহিতই বলিয়া গিয়াছেন যে,—“যেমন কোনও মাতা পুত্রের নেন্নের বিপদাশঙ্কা জন্মাইয়াও পুত্রের বা একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা করে, সেইরূপ লোকের উচিত শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে উচ্চনীচ ও সনকক্ষ সকলের প্রতি সমভাবে ও অপরিমিতরূপে মঙ্গলকামনা করিয়া বাওয়া। কোনও লোক যেন তার সমগ্র জীবনকালে—উত্থানে, ভ্রমণে, উপবেশনে বা শয়নে—নেন্নের এই অবস্থা লইয়াই স্মৃঢ় থাকে। অন্তরের এই অবস্থাই জগতে শ্রেষ্ঠ অবস্থা।” অথবা প্রমাণের দ্বারা ইহা দেখান যাইতে পারে যে, এরূপ মহান্ উপদেশ সমূহ অনেক পরিমাণেই এদেশে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন ধর্মের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ—গৌতম বুদ্ধ হইতে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব পর্য্যন্ত—সকলেই জাতিগত পার্থক্য দূরীকরণের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতেন। কিন্তু তাহারা

কখনও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কোনও শক্ততার আচরণ বা সংগ্রাম ঘোষণা করেন নাই। আর এমন কাজ কিছু করেন নাই, যাহাতে জাতিতে জাতিতে বিরোধ উপস্থিত বা সমাজ-সাম্য ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তাহারা বিদগ্ধ জ্ঞানিতেন যে, পরহিতৈষিতা পরম ধর্ম, এবং তাহাতে মানব-জাতির যে কল্যাণ সাধিত হইতে পারে এমন আর কিছুতে নয়, আর তাহাই আর সমুদয় ধর্মের উৎস্বরূপ, যাহাতে উহার কোনও বিশেষ খর্বতা সাধিত হয় এমন কোনও কাজের সমর্থন তাহারা করিয়া যান নাই। তাহারা যাহার জন্য যুঝিয়া গিয়াছেন, তাহা হচ্ছে—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের সমতা। সেখানে উচ্চ জাতির সাধু পুরুষেরা নিম্ন বা অস্বঃজ শ্রেণীর তিরস্কার, নন্দ, কবীর, চৈতন্য, রবিদাস বা হরিদাস প্রভৃতি হইতে অধিক সম্মানিত বা পূজিত হইতেন না।

সাধু ও মহাপুরুষদিগের বহুকালের চেষ্টা সত্ত্বেও অস্পৃশ্যতা এদেশে চলিতেছেই। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে উহা যেরূপ ভাবে প্রচলিত তাহাতে কোনও যুক্তি নাই—অতিশয় হাস্যকর। আমি একবার কার্ঘ্য-ব্যপদেশে ত্রিচিনোপল্লী জেলাতে যাই, স্থানীয় একটি স্ত্রী পেরিয়াকে ভৃত্য নিযুক্ত করি, এবং পরের দিনে গিয়া যেখানে তাঁবু ফেলিব সেখানে তাহাকে অগ্রে প্রেরণ করি। সেখানে গিয়া দেখি সে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে নাই—রাস্তাতে রহিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমার মাদ্রাজী সঙ্গীগণ বলিলেন যে, আমাদের তাঁবু একজন উচ্চবংশীয় হিন্দুর বাড়ীর সীমানার মধ্যে পড়িয়াছে, আর এই ভূতটি ‘পঞ্চম’ হওয়াতে, সে স্থানে প্রবেশ করিবার অধিকার তার নাই। আমি একবার আমি একটি গ্রামের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অশারোহণে যাইতেছিলাম; আমার সইন্ আমার পশ্চাতে পশ্চাতে হাটিয়া যাইতেছিল। কতকদূর গিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি যে সইন্টি অস্তিত্ব হইয়াছে। কতকক্ষণ পরে সে যেন এক নিগূঢ় ব্যূহ ভেদ করিয়া পুনঃ দেখা দিল। সে নিগূঢ় কারণ শীঘ্রই প্রকাশ পাইল—যে রাস্তাদিয়া আমি আসিতেছিলাম, তাহার দুই দিকে ব্রাহ্মণের নিবাস। প্রকৃত্ত সে সেই রাস্তা দিয়া চলে নাই, পাছে তাহার উপস্থিতিতে সে রাস্তা অপবিত্র হয়। এটাই আমার কাছে বড় আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইত যে যখন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে এত কড়া কড়ি ব্যবস্থা, তখন আমার এক মুসলমান ভৃত্য যে রক্তনশালায় আমার ও আমার মাদ্রাজী সঙ্গীগণের খাত সামগ্রী একজন ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিত, সে ঘরে প্রবেশ করিতে হইত; আর আমি দাপ্তরিক কার্য বিধাত শ্রীরঙ্গম মন্দিরের সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থানেও যাইতে পারিতাম। আমি এ বিষয়ে আমার মাদ্রাজী বন্ধুগণের সহিত আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু দেখলাম যে পঞ্চমদের বিরুদ্ধে তাহাদের এই যে সংস্কার তাহা অতি বদ্ধমূল। অবশ্যই সাধারণ শিক্ষিত হিন্দু ও রামকৃষ্ণ পরম হংসের দ্বারা অতি উচ্চ আচার নিষ্ঠাবান হিন্দুদেরও এক্ষণ বদ বিচার নাই। কিন্তু এক্ষণ লোকের সংখ্যা এখনও খুব কম।

একথা মনে করিলে অবশ্যই ভুল হইবে যে, যে সকল অবিচারের ব্যবহার আমি এখানে উল্লেখ করিলাম, তাহাতে অস্পৃশ্যাগণ জাতি হিসাবেই একবারে অতন্নত (Depressed) ও নিধাতিত হইয়া থাকে। আমি বুঝিতে পারি না কেন ইহাদিগকে এরূপ অতন্নত বা Depressed বলিয়া অভিহিত করা হয়। সম্প্রতি ইহাদিগকে আবার ‘হরিজন’ নামে অভিহিত করা হইয়াছে; আমার মনে হয় এই নামটি অপেক্ষাকৃত ভাল—যদিও ইহার অর্থও বিশেষ ভাল করিয়া বুঝা যায় না। আত্ম (পারীক্ষিক ও নৈতিক) শান্তি (মনের) ও স্বাধীনতা—এই তিনটি লোকের স্বত্বানুব

হেতুর মধ্যে প্রধান ; অসভ্য গ্রামিকেরা—যাহাদিগের মধ্যে এই ‘হরিজনেরাই’ অধিকাংশ—সুসভ্য নাগরিকদিগ হইতে সাধারণতঃ এ তিনেরই অধিক অধিকারী। বস্তুতঃ যদি এই বহুপুরুষের মজ্জাগত অভ্যাস বশে কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের কার্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য না হইয়া পড়িত, তবে অধিকাংশের না হইলেও, অনেক ভদ্রলোকের পক্ষেই, কলম ছাড়িয়া ইহাদের মত লাদল ধরিতে গেলে অধিক মঙ্গলের কারণ হইবে।

কিন্তু যদিও আমি মনে করি যে, ‘হরিজনেরাই’ উচ্চ ভারতীয় হিন্দুগণ হইতে নির্ধাতিত বা অল্পমত হইয়া ব্যাধির যাতনা অধিক ভোগ করে না, বরং মোটের উপর ইহারা তাহাদের অপেক্ষা আরও অধিক আনন্দপূর্ণ জীবনই যাপন করে, তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে মানিয়া লইতে হইবে যে, গৌতম-বুদ্ধের সময় হইতে এই অস্পৃশ্যতাকে বর্জনের নিমিত্ত যে সকল চেষ্টা হইয়া আসিতেছে তাহা চালাইতে হইবে। রামকৃষ্ণ মিশন, আর্য্যসমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও হিন্দু মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে গুরুতর কোনও বিরোধ সৃষ্টি না করিয়াই সে বিষয়ে তৎপর। ‘হরিজন’গণ সৎক্ষে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ আর একটা কাজ করিতে পারেন—তাহা হচ্ছে যৌথভাবে কৃষি ও ব্যবসায়াদির উন্নতি করিয়া ইহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান। আর একটা বিষয়ে ইহাদের মধ্যে সংস্কার অত্যাৱশ্যক—স্বরাপানের হরন্ত সামাজিক পাপ ইহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবেই বিগ্ৰহান। সাধুলোকেরা তাহাদের চরিত্রের মঙ্গলময় প্রভাব দ্বারা ইহাদের মধ্যের এই পাপকে অনেকটা বিদূরিত করিতে পারেন। ত্রিশাধিক বৎসর পূর্বে আমি একবার রেওয়া রাজ্যে যাই ; তখন তত্রত্য একটা বিস্তৃত প্রদেশের সমুদয় গোঁও জাতির লোকদিগের মধ্যে এই প্রকার একটা পরিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম—ইহারা স্ত্রীপুরুষ সকলেই অত্যন্ত স্বরাশক্ত ছিল ; আমার যাওয়ার কতদিন পূর্বে এক জন যোগী সাধু সেখানে যান, আর সকলকে স্বরাভ্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আসেন। আর তৎকালে এক্ষণে যে স্থানে বাস করিতেছি (রাঁচি জেলাতে) সেখানেও এক বিহৃত ভাগের ওরিয়ান অধিবাসীরা এক্ষণে একজন সাধুর অহঙ্কারে স্বরাভ্যাগ করিয়াছে। আমি জানি রায়পুর ও বিলাসপুর এই দুইটা জিলার বহু সংখ্যক চামার—যাহাদিগকে সংনামী চামার বলা হয়,—আর একজন সাধুর আদেশক্রমে স্বরা ভ্যাগ করিয়াছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং নিজেদের সমাজপ্রচলিত ঘনীতির দূরীকরণ দ্বারাই প্রকৃত অস্পৃশ্যতা বর্জনের কার্য সমধিক সংসাধিত হইবে।

ইদানীং নব্য ভারতে এক শ্রেণীর সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে—ইহারা দ্বন্দ্ব ও বিবাদ সৃষ্টি করিয়া কেবল গলাবাকির জোরেই কার্য সাধন করিতে চাহেন। পাশ্চাত্যের দীক্ষায় ইহারা তথাকথিত ‘সাম্য’ ‘গণতন্ত্র’ ‘জন মত’ প্রভৃতি কতকগুলি দুর্বোধ্য কথা লইয়া সমাজের এমন অধিক জঞ্জাল সব সৃষ্টি করিতেছে যাহাতে সমাজ আরও অভাব, অকিঞ্চিৎকরতা, বাহুল্য ও দুর্বলতার দোষে দুষ্ট হইতেছে। পূর্বে যে সমাজে মিল ও মৈত্রী বিরাজ করিত, সেখানে বিবাদ ও শত্রুতার সৃষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করিয়া ইহারা যে ক্ষতি সাধন করিতেছে, তাহাই আর সকলের উপরে। মানবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে বদান্ধতা ও পরার্থপরতা, যে সংস্কার তাহার সঞ্জন না করিয়া বরং তাহা গুরুতর-রূপে কমাইয়া দেয়, তাহা একটা প্রতারণা ও প্রলোভনের ফাঁদ মাত্র। অন্তর্মত দিগের ‘উত্তোলন’ সৎক্ষে আর দুইটা বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন—ইহার একটা সহ-ভোজন। সমাজের বহুদূর পর্য্যন্ত

ইহা বিস্তারলাভ করিতে পারে না। কারণ অস্পৃশ্যদের মধ্যেই এমন বহু সম্প্রদায় আছে যাহারা পরস্পর সহ ভোজন করিতে নারাজ; আর ইহাদের অনেকে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু, এমন কি, ব্রাহ্মণের হাতেও অন্নগ্রহণ করিবে না। আর এক বিষয়—দেব মন্দিরে প্রবেশ। ‘হরিজন’দিগকে দেবমন্দির প্রবেশ করিতে না দেওয়ার পক্ষে কোনও যুক্তি দেয়া যায় না বটে; কিন্তু হরিজনগণ বা তাহাদের চালকগণ সে জন্ত অত্যাধিকারপে জোর কেন করিবেন, তাহারও যুক্তি নাই। দূর হইতে দেববিগ্রহ দর্শন করিয়াই এযাবতকাল ইহাদের ধর্মপিপাসা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিতেছে—অনেক উচ্চজাতি হিন্দুও তাহাই করে। সুপ্রসিদ্ধ পারিয়া সাধু নন্দ বহুদিন পর্যন্ত প্রতাহ চিদাম্বরম মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া গান করিত ও স্তোত্রাদি পাঠ করিত; তৎপর ব্রাহ্মণগণই তাহাকে মন্দির মধ্যে লইতে চাহে। তখন নন্দ বলিয়াছিলেন—“হে ব্রাহ্মণগণ, আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি পেরিয়া, শূকর ও ছাগ ভক্ষণ করিয়া থাকি, মৃত পশু টানিয়া লইয়া যাই, তাহাদের চর্ম ও অস্থি বহন করি।” তদন্তরে ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন—“নিম্নকুলে তোমার জন্ম হইয়াছে, তাহাতে কি? ভগবানের কোড়ে তোমার স্থান অতি উচ্চ।” আবার এই মন্দির প্রবেশ কেবল উচ্চজাতি সমস্যা হিন্দু ও হরিজন দিগের মধ্যেই নিবন্ধ নয়। সাধু শ্রীনারায়ণ গুরু তাহার শিষ্য এজ্রাবাদিগের জন্ত এক মন্দির নির্মাণ করেন; তাহাতে আদি দ্রাবিড়দিগকে প্রবেশ করাইতে তাহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। মোট কথা অস্পৃশ্যতা এমনই একটা দৃঢ়মূল বিষয়—পমাজের সকল স্তরের লোকের মধ্যেই ইহা এমন ভাবে ব্যাপ্ত যে, বিচার পূর্বক এদিকে কিছু করিতে গেলে, ইহার প্রকোপ কতকটা মাত্র কমান বা নরম করিবার আশা করা যাইতে পারে মাত্র। সমগ্রের সংস্কার বিষয়ে সর্বদাই এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে—যেন রোগ অপেক্ষা তাহার প্রতিকার জনিত ব্যাধিই গুরুতর না হইয়া দাঁড়ায়।

আমি কোনও প্রকার চুক্তি বা প্যাক্টের পক্ষপাতী নহি। বরং আমার আশঙ্কা ও ভীতি ইহাতে অধিক। আমার বিশ্বাস লক্ষ্যের প্যাক্ট বা চুক্তি হইতে হিন্দু মুসলমানের বিচ্ছেদ জন্মিয়াছে; বাদলার চুক্তিতে তাহা আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে। পুণার প্যাক্ট বা চুক্তিতে সেইরূপ আর একটা বিচ্ছেদের সূচনা যে না হইবে তাহা কে বলিতে পারে? রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সাময়িক প্রয়োজনে বিবাদী পক্ষের মধ্যে চুক্তি বা প্যাক্ট হইয়াছে। কিন্তু হায়! রাজনৈতিক জগতে আজ পর্যন্ত এমন কোনও অপরসায়ন আবিস্কৃত হয় নাই, যাহা মহত্ত্বপ্রকৃতির নীচ পাণ্ড প্রকৃতিতে প্রয়োগ করিয়া, উহাকে পরার্থপরতা ও প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমের পবিত্র ধর্মে পরিণত করিতে পারিয়াছে!

খোলা চিঠি—গান্ধীজীর প্রতি

সবিনয় নিবেদন,

আপনি পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, আপনার ধর্মবিশ্বাস বেদ এবং তাহার পরবর্তী শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে বলিতেছেন যে, শাস্ত্রের যে বাক্য সর্ববাদিসম্মত নীতি-বিরোধী, আপনি তাহা পরিত্যাগ করেন, যাহা নীতি-সম্মত, তাহাই গ্রহণ করেন। আপনার পূর্ব বাক্য এবং বর্তমান বাক্য পরস্পর বিরোধী। আপনার ধর্মবিশ্বাস যদি শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে আপনার নিজের বুদ্ধি অপেক্ষা শাস্ত্রকারের বুদ্ধির উপর আপনার অধিক আস্থা থাকিত, সুতরাং যেখানে শাস্ত্রবাক্য বিরোধী মনে হইত, সেখানে আপনি স্থির করিতেন যে, শাস্ত্রকারের বুদ্ধি অপেক্ষা আপনার বুদ্ধি অল্প বলিয়া আপনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তকে নীতিবিরোধী বলিয়া মনে করিতেছেন। আপনি যখন তাহা না করিয়া যে শাস্ত্রবিধান আপনার নিকট নীতিবিরোধী বোধ হইতেছে তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন, তখন হয় আপনি মনে করিতেছেন যে, শাস্ত্রকারগণ সম্মতিপরায়ে নহেন, নচেৎ ভাবিতেন যে, শাস্ত্রকারগণের বুদ্ধি আপনার বুদ্ধি অপেক্ষা অল্প বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের বিধান ভবিষ্যৎ হিন্দুর নিকট নীতিবিরোধী বলিয়া মনে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই ইহা কিছুতেই বলা যায় না যে, আপনার ধর্মবিশ্বাস শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য বটে যে, শাস্ত্রের যে বাক্য আপনার নিকট নীতিসম্মত মনে হয়, আপনি তাহা গ্রহণ করেন, কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণে আপনি বলিতে পারেন না যে, আপনার ধর্মবিশ্বাস শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাস্কিন বা টলষ্টয়ের যে বাক্য আপনার নিকট নীতিসম্মত মনে হয়, আপনি তাহা নিশ্চয়ই গ্রহণ করেন, যাহা নীতিবিরোধী মনে হয়, তাহা গ্রহণ করেন না। এ ক্ষেত্রে আপনি রাস্কিন বা টলষ্টয়ের বাক্য অপেক্ষা শাস্ত্রবাক্যের প্রতি কি প্রকারে অধিক আস্থা প্রদর্শন করিতেছেন? সুতরাং আপনার ধর্মবিশ্বাস রাস্কিন বা টলষ্টয়ের রচনার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা বলিবার কোনও তাৎপর্য আছে কি?

সনাতনী হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্র-বাক্য যেখানে তাঁহাদের নিকট নীতিবিরোধী মনে হয়, সে স্থলে তাঁহারা মনে করেন, “আমরা বুদ্ধি দ্বন্দ্ব অথবা রাগদ্বৈজ্ঞানিত, এই কারণে আমরা শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিতেছি না; দৈশ্বারাদানা, যোগসাধনা এবং সুকঠোর তপস্যার দ্বারা শাস্ত্রকারগণের বুদ্ধি নির্মল হইয়াছিল, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অধিক দূরদর্শী—ত্রিকালদর্শী ছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রের বিধান পালন করাই উচিত।” এইরূপ ভাবিয়াই তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির নিকট উপদেশলাভের জন্য উপস্থিত হন, তিনি তাঁহাদের সংশয় নিরস্ত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, শাস্ত্রবাক্য বাস্তবিক নীতিবিরোধী নহে। কিন্তু আপনি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য বুঝিবার জন্য এই প্রকার যত্ন না করিয়া শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা করিতেছেন।

এখানে কাহার বিশ্বাস যথার্থই শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত? আপনার, না সনাতনী হিন্দুর?

এ বিষয়ে প্রকৃত যোগাঙ্গ কি হইবে, সে বিষয়ে যদি কোনও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে গীতার প্রধান বিষয়ের আলোচনা করিলে সন্দেহ নিরস্ত হইবে। অর্জুনের নিজের বুদ্ধি অনুসারে

মনে হইয়াছিল, যুদ্ধ করা অস্বাভাবিক হইবে, বর্ণসঙ্ঘর্ষ হইবে। তিনি জানিতেন যে, এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করাই শাস্ত্রের বিধান, কারণ অর্জুন ক্ষত্রিয় এবং ইহা ধর্মযুদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রবিধানটি “সর্ববাদিসম্মত নীতির” বিরোধী বলিয়া তাঁহার মনে হইল, তাই তিনি অস্ত্র ফেলিয়া বলিলেন, “আমি যুদ্ধ করিব না।” কিন্তু ভগবান বলিলেন, “অর্জুন, তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। কারণ, ইহাই তোমার স্বধর্ম (গীতা ২।৩১)। তুমি যদি স্বধর্ম পালন না কর, তাহা হইলে তোমার পাপ হইবে (গীতা ২।৩৩)।” ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে, ভগবানের ইহাই উদ্দেশ্য যে, কর্তব্য নির্ণয় বিষয়ে মানবের নিজবুদ্ধি অপেক্ষা শাস্ত্রবাক্যের উপর নির্ভর করা উচিত। ষোড়শ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে এ কথা ভগবান স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, “তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকাৰ্য্য্য ব্যবস্থিতো”—কি কর্তব্য এবং কি অকর্তব্য ইহা নির্ণয় করিবার জন্ত শাস্ত্রই প্রমাণ।

ভগবান অর্জুনকে সহজ বুদ্ধি অনুসারে কর্তব্য বুঝাইবার জন্য প্রয়াস করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে বলিতেন দুর্যোধন রাজা হইলে পৃথিবীর অনেক অমঙ্গল হইবে, যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ-জনিত অমঙ্গল অপেক্ষা সে অমঙ্গল অনেক বেশী, সুতরাং যুদ্ধ করিলেই কম অমঙ্গল হইবে। কিন্তু এ সকল কথা ভগবান বলিলেন না। তিনি বলিলেন, “যুদ্ধ কর। কারণ, ইহাই শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য।” সুতরাং ভগবানের ইচ্ছা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, লোকে নিজ বুদ্ধি অপেক্ষা শাস্ত্র-বিধানের উপরই বেশী নির্ভর করিবে। অতএব সনাতনী হিন্দুগণ, যে ভাবে শাস্ত্রের উপর নির্ভর করেন তাহাই গীতার অভীপ্সিত, আপনি যেভাবে শাস্ত্র অনুসরণ করেন তাহা গীতার অভীপ্সিত নহে। যদি বিশ্বাস থাকে যে, শাস্ত্রকারগণ আমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান, যদি বিশ্বাস থাকে যে, তাঁহারা জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, কাহারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না (প্রকৃত জ্ঞানী কাহারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে পারেন না) তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণের আদেশ অনুসরণ করিতে ইতস্ততঃ করা উচিত নহে।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা উচিত, সহজ বুদ্ধি বা নীতিমূলক দ্বারা কর্তব্য নির্ধারণ করা যায় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন, ভগবানের উপাসনা করা উচিত। উপাসনা করা অনেক সময়-সাপেক্ষ; মন্দির নির্মাণ, পুজার উৎসবসমূহ প্রভৃতিতে অনেক অর্থব্যয় হইয়া থাকে। সহজ বুদ্ধিতে মনে হইতে পারে, ঐ সময় এবং অর্থ দরিদ্রের দুঃখমোচনে নিযুক্ত করাই সর্ববাদিসম্মত নীতির অনুকূল। এইরূপ যুক্তি অনুসারে আপনি কি বলিবেন যে ঈশ্বরের পূজার জন্য যে সময় ও অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা না করিয়া সেই সময় ও অর্থ দরিদ্রের দুঃখমোচনের জন্যই ব্যয় করা উচিত ছিল? শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্য ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ না করিয়া অনাখ্যায়, পান্থনিবাস, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেই কি তাঁহাদের জীবন অধিকতর সার্থক হইত? ইহা বোধ হয় আপনার মত নহে। আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরের পূজা ও ধ্যান করিলে অর্থ ও সময়ের অপব্যবহার হয় না। এ ক্ষেত্রে সর্ববাদিসম্মত নীতি পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবাক্যের উপর সমধিক আস্থা স্থাপন করাই উচিত নহে? ধর্মগ্রন্থে আস্থা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দলপতির নীতির উপর নির্ভর করিবার ফলে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরদ্রোহী সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, আপনি ত’ তাহা

দেখিতেছেন? ফলতঃ কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান—যে কেহ নিজ ধর্মগ্রন্থে আস্থা পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিজ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইবার চেষ্টা করিবেন, তাহারই পরিণাম অশুভ। তাই বলিয়া বুদ্ধির সাহায্য লইবার প্রয়োজন নাই—ইহাও ঠিক নহে। কিন্তু বুদ্ধি শাস্ত্রালুগামিনী হওয়া প্রয়োজন।

শাস্ত্রবাক্য আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বোধ হইলে আচার্য্যগণ প্রণীত ভাষা এবং সদগুরু সাহায্যে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাস্তবিক বিরোধ নাই, উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় আছে। আপনার কি তাহা করাই উচিত ছিল না? তাহা না করিয়া আপনি এই সকল পরস্পর বিরোধের উল্লেখ এ ভাবে করিয়াছেন, যাহাতে আপনার শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এবং পাঠকের মনেও সেই অশ্রদ্ধার ভাব সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের শেষ তিন শ্লোকে কিন্তু এইরূপ সংশয় এবং অশ্রদ্ধার নিন্দা আছে। দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে আচার্য্যদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রগ্রন্থে আশ্চর্য্য-রূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক বিষয়ে কয়েকটি তুচ্ছ ব্যাপারে সামান্য মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু গুরুতর ব্যাপারসমূহে কোথাও মতভেদ নাই। এ জন্ম শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, গঙ্গাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ নূতন দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেহই নূতন সামাজিক ব্যবস্থা দিয়া যান নাই, সকলেই মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থকে সামাজিক বিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সামাজিক ব্যবস্থাতে নূতন মত স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের পর। পাশ্চাত্য সামাজিক প্রথার অনুকরণে এই সকল নূতন মত প্রচলিত হয়। রাজা রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সংস্কারকগণ এই সকল মতের প্রচারক। আপনার পূর্ব্বকার বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইয়াছিল যে, আপনি এই সকল পাশ্চাত্য-অনুকারী সমাজ-সংস্কারকের দলভুক্ত নহেন। কিন্তু এক্ষণে আপনার বিবৃতিগুলি অনুশীলন করিয়া বোধ হইতেছে যে, এই সকল সমাজ সংস্কারকের সহিত আপনার প্রভেদ অতি ক্ষীণ।

আপনি প্রচলিত শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রের যে বাক্য মনঃপূত না হয় তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিলে শাস্ত্রের মর্যাদা কিছুই রক্ষা হয় না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যেখানে আপাততঃ বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়, সেখানে চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ সামঞ্জস্যের উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আপনি দাক্ষিণাত্যে একটি স্মৃতিগ্রন্থ দেখিয়াছেন। স্থানীয় অন্নসংখ্যক লোকই মাত্র করে, দূরদেশস্থ পণ্ডিতগণ তাহার অস্তিত্বও জানেন না। কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলন প্রসঙ্গে এই স্মৃতির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয়। কারণ সনাতনীগণ এক্ষণে কোনও অথাত স্মৃতির উপর আপনাকে আস্থা স্থাপন করিতে বলিতেছেন না। তাঁহারা যে সকল স্মৃতিগ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিতেছেন, তাহারা সমভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ, যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন, তাহার মধ্যে কোনও পাঠভেদ নাই, স্মরণ্য প্রক্ষিপ্ত হইবার কোন আশঙ্কাই নাই। কেবল অস্পষ্টতা সম্বন্ধে নহে, অল্প বিষয়েও আপনি এইরূপ বহু অবিদিত স্মৃতিগ্রন্থের সুস্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং যাহা আরও হৃৎপথের বিষয়—যাহারা শাস্ত্রবিশ্বাসী, তাহাদিগকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল শাস্ত্রবিধান উল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি উল্লেখ করিতে পারি যে, আপনি পূর্ব্বে সর্দা আইন সমর্থন করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, এই বিষয়ে আপনার মত কোন

শাস্ত্রগ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথবা এতদ্বিমুখে শাস্ত্রবিধান কোন সর্ববাদিসম্মত নীতির বিরোধী? আপনার প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন আরও আশ্চর্যজনক। এ ক্ষেত্রে যে নিষেধবাক্য সকল সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, যে বাক্য কোনও নীতির বিরোধী নহে এবং যে গীতাকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ মনে করেন, সেই গীতাতেও যে বাক্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, আপনি সে বাক্যও গ্রাহ্য করিতেছেন না। আপনি যতদিন এই সকল মত পোষণ করিবেন, ততদিন কিরূপে বলিতে পারেন যে, আপনার বিশ্বাস “বেদ এবং তাহার পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত?”

আপনি যে সামাজিক বিষয়ে সত্যদর্শন করিয়াছেন অতএব আপনার পক্ষে শাস্ত্রের অপেক্ষা নিষ্প্রয়োজন, ইহাও বলা যায় না। কারণ এই অসবর্ণ বিবাহেরই আপনি পূর্বে নিন্দা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সমর্থন করিয়াছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আপনি মধ্যে মধ্যে ভুল করিয়াছেন, ইহাও আপনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আপনার বর্তমান সমাজ ও ধর্মবিষয়ক মত যে শাস্ত্র হইতে পারে না, এ বিষয়ে আপনি নিজে কিরূপে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন?

অস্পৃশ্যতার বিধান উপনিষদে আছে, “তস্মাৎ জনসং নেয়াৎ অন্তম্ নেয়াৎ” বৃহদারণ্যকে উপনিষদ, [“অস্বাজগণের সহিত একত্র থাকিবে না, তাহাদের পল্লীতে যাইবে না”] এ বিধান সকল স্মৃতিগ্রন্থে আছে। সকল গ্রন্থেই যে এই বিষয়ই প্রসিদ্ধ করা হইয়াছে, ইহা অসম্ভব।

আপনি মনে করেন যে, ইহা নীতিবিরোধী। কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রণালীতে বিচার করিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে, ইহাতে নীতিবিরোধী কিছুই নাই।

আপনি জন্মান্তর এবং কর্মফলে বিশ্বাস করেন কি? হিন্দুর সকল ধর্মশাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

যাহারা উৎকৃষ্ট কর্ম করে, তাহারা শ্রেষ্ঠ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, যাহারা হীন কর্ম করে, তাহারা অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, ইহা কি আপনি বিশ্বাস করেন? উপনিষদে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, অস্ত্র ধর্মশাস্ত্রেও আছে। গীতা ৯ অধ্যায় ৩২ শ্লোকে “পাপযোনি” শব্দের উল্লেখ আছে। আজকাল যাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলা হইয়াছে, ইহাদিগকে গীতার পাপযোনি বলা হইয়াছে। ইহার পূর্বজন্মে উচ্চ জাতি অপেক্ষা বেশী অসদাচরণ করিয়াছিল।

পূর্বজন্মকৃত কর্মের সংস্কার ইহজন্মে বিদ্যমান থাকে। পূর্বজন্মের অসদাচরণের ফলে ইহাদের মধ্যে মৃত পশুর মাংস আহারের এবং গদ্যপানের সমধিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। অপর বিষয়েও ইহাদের শুচি অশুচি কর্তব্য জ্ঞান কম।

সাধুসঙ্গ করা ভাল, ইহা কি আপনি বিশ্বাস করেন? শাস্ত্রে বলে, ইহা ভাল, কারণ, সঙ্গগুণে সাধুর সদগুণগুলি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

যাহারা অসদাচরণপরায়ণ, তাহাদের সঙ্গ সেই কারণে শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন। মাতালের সহিত অধিক মেলাগেশা করিলে মাতাল হইবার আশঙ্কা থাকে। হুশ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত মিশিলে চরিত্র স্থলনের আশঙ্কা অধিক।

আপত্তি হইতে পারে, নীচজাতি সকলেই খারাপ নহে, উচ্চ জাতির সকলেই ভাল নহে। ইহার উত্তর এই যে, নীচ জাতির অধিকাংশ খারাপ, উচ্চ জাতির অধিকাংশ ভাল। অধিকাংশের

চরিত্রের উপরই সাধারণ নিয়ম প্রণয়ন করিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ, সকলক্ষেত্রে তাহা সঠিক জানিয়া ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। উচ্চ জাতির যে ব্যক্তির চরিত্র খারাপ, তাহার সদ বর্জন করাও শাস্ত্রের উপদেশ।

অন্ত্যজ্ঞান সাধারণতঃ অশুচি অবস্থায় থাকে। যিনি শৌচাচার রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে ইহাদের স্পর্শ সন্মুখে সাবধান হইতে হইবে। “শৌচ” আচার রক্ষা করা প্রয়োজন, ইহা গীতাও বলেন। অন্ত্যজ্ঞানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা নিষিদ্ধ নহে। এবং ইহাদিগকে ঘৃণা করাও উচিত নহে। গীতা বলিয়াছেন,—

বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে-গবি হস্তিনী।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনাঃ ॥

“সদগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল,—সকল ক্ষেত্রেই পণ্ডিত ব্যক্তি সমদর্শী।” ইহা জ্ঞানের কথা, ব্যবহারের কথা নহে। একটু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, গুরুত্ব ও কুকুরের সহিত সমান ব্যবহার সম্ভব নহে, সমুচিতও নহে। কিন্তু যেহেতু সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন, এবং ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কোনও বস্তুর সত্তা নাই, এজন্য ব্রহ্মবিদ পণ্ডিতগণ সর্বত্র সমদর্শী।

গীতায় উল্লিখিত শাস্ত্রশব্দের ব্যাখ্যা করিয়া আপনি বলিয়াছেন যে, এখানে শাস্ত্র, শব্দ দ্বারা গীতা ভিন্ন কোনও গ্রন্থকে লক্ষ্য করা হয় নাই, “জীবন্ত প্রাণাণিক বস্তুতে যে, ত্রাযা আচরণ”, শাস্ত্রশব্দে তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। গীতার বহু টীকা আছে, কোথাও শাস্ত্রশব্দের একরূপ অর্থ করা হয় নাই। শাস্ত্রশব্দের অর্থ সুবিদিত,—শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ, প্রভৃতি গ্রন্থ। গীতাতে প্রধানতঃ বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় করা হইয়াছে। যজ্ঞ কিরূপে করিতে হইবে, দান করিবার সংপাত্র কে, অসংপাত্র কে, এ সকল কথা গীতাতে নাই। সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা, দশবিধ সংস্কারের কথা, অল্পই গীতাতে আছে। স্মৃতিগ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, “কোন্ কার্য্য কর্তব্য; কোন্ কার্য্য অকর্তব্য; এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ” (গীতা ১৬২৪)। আপনি বলিতেছেন, “শাস্ত্রের সকল বাক্য প্রামাণ্য নহে; যে অংশে উচিত কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সেই অংশই প্রামাণ্য।” কিন্তু কোন্ কর্ম্ম উচিত তাহা জ্ঞানিবার উপায় কি? গীতার মতে শাস্ত্র বাদ দিয়া ঠিক করা যায় না কোন্ কর্ম্ম উচিত। কিন্তু আপনি শাস্ত্র বাদ দিয়াই উচিত কর্ম্ম ঠিক করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং আপনার মত গীতার সহিত অনন্বত হইতেছে। অধিকন্তু আপনি “শাস্ত্র” শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া, কাল্পনিক অর্থ লইতেছেন।

গীতা বলিয়াছেন, আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, আত্মশুদ্ধির জন্ত কর্ম্ম করিতে। বর্তমান ক্ষেত্রে আপনার কর্ম্মে আসক্তি দেখা যাইতেছে না কি? আপনি লিখিয়াছেন, আপনার সহকর্ম্মীরা যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাহা হইলে জীবনে আপনার কোন স্পৃহাই থাকিবে না। আপনার হ্রায় মহৎ ব্যক্তির মুখে এইরূপ অভিমানের কথা কি সাজে? আপনি বলিয়াছেন, অনশনে প্রাণত্যাগের সংকল্প ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার উপায়। গীতা ৯২২ শ্লোকে মনস্কামনা সিদ্ধির জন্ত প্রার্থনার কথা আছে—কিন্তু সেখানে উপবাসের ত’ কোনও কথা নাই। বরং গীতায় ভগবান্ অজ্ঞানকে যোগী হইতে বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন, একান্ত ভাবে আহার পরিত্যাগ করিলে যোগ হয় না।

ঐতিহ্যদেব আচণ্ডাল সকলকে হরিনাম দিচ্ছিলেন, তাঁহার শ্রী ভক্তের মধ্যে কয়েকজন অস্পৃহ ছিলেন, কিন্তু তিনি কোথাও বলেন নাই যে, জয়রাগ দবের গদীর মধ্যে যাওয়া তাঁহাদের উচিত, বরং তাঁহারা ভিতরে যাইতে চাহেন নাই বলিয়া প্রাণসা করিয়াছেন।

যদি আমার পত্রের কোন অংশ রুচ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মার্জনা করিবেন। শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ধর্ম্মবিশ্বাসের আপনি নিন্দা করিয়াছেন; আমার চক্ষে আপনার যে যুক্তি ভ্রূপূর্ণ মনে হইয়াছে, তাহা না দেখাইয়া দিনে আপনার প্রতি আমার কর্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে, আমার নিজ ধর্ম্মের প্রতি কর্তব্যও অসম্পূর্ণ থাকে, ইহাই আমার ধারণা। ইতি এই ডিসেম্বর ১৯৩২ সন।

ভবদীঃ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার মানের গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পথালোচনা সবচেয়ে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ প্রণালী (যাহা ভারতের সাধনার এক বিশেষ লক্ষ্য) সব সাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা সাপেক্ষ।]

সনাতনপন্থী-বনাম-সংস্কারবাদী।—

আত্ম-প্রতারণা

গত ‘কার্টিক’ ও ‘অগ্রহায়ণ’ সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ সরসী লাল সরকারের “বাস্তব পরিচয়ে মনস্তত্ত্ব” নামক এক বিবৃতি বাহির হইয়াছে। তাহা আমার লিখিত “বাস্তব পরিচয়” শীর্ষক প্রবন্ধের বিজ্ঞপ ও প্রতিবাদ উদ্দেশ্যে লিখিত।

ঐ বিবৃতির ভিতর ডাঃ সরকার আমার মনস্তত্ত্ব লইয়া অনেক কথা কহিয়াছেন। আমার মনস্তত্ত্ব লইয়া কথা কহিতে গিয়া তিনি আরও দশটা অবাস্তব কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আমার মনস্তত্ত্ব লইয়া আলোচনা “ভারতের সাধনার” পাঠকগণের নিকট সময়ের অপব্যয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর সেই প্রসঙ্গে আমার প্রতি বিজ্ঞপোক্তিও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। কাজেই ঐ সব কথার আলোচনা করার কোনই আবশ্যকতা নাই।

পাঠকগণের সমক্ষে “বাস্তব পরিচয়” আছে। আমার মত বলিয়া আমি কোনও সিদ্ধান্ত দিবার চেষ্টা ঐ “বাস্তব পরিচয়ে” করি নাই। আমি কেবল মাত্র ঘটনার পর ঘটনা বর্ণন করিয়া সিদ্ধান্তের ভার পাঠকগণের স্ব স্ব বিচারবুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। পাঠকগণের একজন ডাঃ সরকার ঘটনা কয়টার বিচার করিয়া ঘটনা হইতে বিধবার উপবাস, সতীদাহ, ও সর্দা আইন সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত না করিয়া বা তাহার চেষ্টাও না করিয়া একেবারে আরও কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন ও সনাতন-ধর্ম্ম-বিধাসীদের সহিত তাহার ত্রায় সংস্কার-বাদীর ভেদ কোথায় তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আবার দেখিতেছি—আমায় বাস্তব পরিচয়ই দিতে হইবে। যুক্তি তাঁহারও যেমন আছে, অগ্র সকলেরও সেই রকম আছে। তিনি যদি “জীব জীবেরই মধ্যে ঈশ্বর রহিয়াছেন” এই কথাটাকে বস্তু বলিয়া বিবাস করেন, তবে আমার মত সনাতন-পন্থী যে “ভারতবর্ষকে চিরদিনের জন্য জীবন শূন্য ও গতিহীন করিয়া রাখিতে চাহেন”, এই অভিযোগ করেন কোন্ যুক্তিতে? আমার মনস্তত্ত্ব বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, আর এই অভিযোগের মনস্তত্ত্ব কি? ঈশ্বর কি কেবল

ডাঃ সরকার ও তাঁহার ন্যায় মনের ভিতর দিয়া প্রেরণা পাঠান, আর আমাদের মনের ভিতর দিয়া কি কেবল আত্ম-প্রেমই (আত্মস্মৃতিতাই?) বিকশিত করেন? এই একচোখো ঈশ্বর সনাতন-পন্থী স্বীকার করেন না। ইহা লিখিতে আমাদের কোনই লজ্জা নাই!

আর এইরূপ পক্ষপাতী ঈশ্বরের প্রেরণা লইয়া ডাঃ সরকার যে সকল বাজে কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক :—

(১) শূদ্রের সম্বন্ধে মনুষ্য বিধান কি ছিল না ছিল তাহা লিখিবার পূর্বে শূদ্র কে ছিল ও শূদ্রের কোনও পাতক নাই, তাহাও মনে রাখিতে হয়।

(২) “গোমাংস ভক্ষণ” প্রচলিত ছিল বলিয়া এত আশ্ফালন কেন? আজ যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করিয়াছেন সেই সকল হিন্দুবংশাবতঃসদের কি উন্নতি হইয়াছে তাহা দেখিবার ও ভাবিবার ক্ষমতা কয় জনের আছে? সে ক্ষমতা থাকিলে এই বিষয়ে শুনিবার প্রবৃত্তিও কমিয়া যাইত।

(৩) ব্যাস দেবের জন্ম কথা, কর্ণের জন্ম কথা কহিবার পূর্বে চরকসংহিতা পড়িয়া হিন্দুর মনুষ্যজন্ম-তত্ত্ব-কথা বুঝিতে হয়। পুরাণ না পড়িয়া, হিন্দুর জন্ম তত্ত্ব না বুঝিয়া বশিষ্টকে গণিকা-পুত্র ও ব্যাসদেবকে ধীবরী-পুত্র ও নারদকে ঐরকম একটা কি বলা এক শ্রেণীর সংস্কারক-দিগের একটা রসনা ও লেখনীর ব্যভিচার-বিলাস হইয়াছে। আমাদের পাণের ভোগ যে ইহাদের সহিত এক সমাজে থাকিতে হয়।

(৪) বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সম্বন্ধের সভাপতি রেলে আসেন, এবং অন্ততঃ দশ হাজার লোক তাঁহাকে হাওড়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। ঐ সম্বন্ধে ডাঃ সরকার কি “শুনিতে পাই”য়াছেন তাহা লিখিবার পূর্বে সত্যটা সন্ধান করাও কি ভব্যতাবোধ জন্মে না?

(৫) ডাঃ সরকার বলিয়াছেন—“হিন্দু সনাতন ধর্মের সার কথা এই যে জীব মাত্রেরই মধ্যে ঈশ্বর রহিয়াছেন।” সনাতন ধর্ম কি তাহা না জানাটা দোষের কথা নহে। কিন্তু না জানিয়া জানার বাহ্যুহরি করা ষ্টুতা। সং, চিত্ত, আনন্দ এই ত্রিতত্ত্ব-সত্তার নিত্যত্ব, জ্ঞানময়ত্ব ও বৈচিত্র্য লীলায় স্ফুর্তি এই ত্রিরূপে জগতে দেখা যায়। এবং এই ত্রিতত্ত্বের ভিত্তিতে জন্মান্তর, ঈশ্বর ও জীবাত্মা এই ত্রিসত্য সনাতন ধর্মের মূল তত্ত্ব। স্পৃশ্যস্পৃশ্য বিচার জন্মান্তরবাদ মূলক। না মানিলে হিন্দু হওয়া বা হিন্দু থাকা চলে না। উচ্চনীচ ভেদ বিচার সকল দেখে ও সকল জাতির ভিতর আছে ও চিরকাল থাকিবে। ধনদম্ভ, বিভাদম্ভ, পদদম্ভ ও চতুরতাদম্ভ মনুষ্য সমাজে কস্মিন কালেও লোপ পাইবে না। কিন্তু জগৎ স্পৃশ্যস্পৃশ্য বিচার এই চারি প্রকার দম্ভ হইতে মানুষ নাত্রকেই প্রাক্তন কক্ষফলের অবশ্যাপ্তাবী অধীন রাখিয়া উচ্চবর্ণকে দম্ভের আত্মবিনাশী গতি হইতে রক্ষা করিয়াছে, আর নীচজাতিকে ভগবদ্বাক্য স্মরণ করাইয়া দিয়াছে—“স্বকর্ষণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিঃ বিন্ধতি মানবঃ।” সনাতন সমাজ ব্যবহারে এই তত্ত্ব মানিয়া আসিয়াছে—কোন দিন কাহাকেও ‘চিরবঞ্চিত’ করিয়া রাখে নাই। ক্রীতদাস চন্দ্র গুহকে কোল দিয়াছিলেন, হতুমানেস পূজার ব্যবস্থা আজও সর্বত্র প্রচলিত, তত্ত্ববায়পুত্র বম্ভবর শিবাবতার ও তাহার পত্নী বাতুকী পার্শ্বতী বলিয়া আজও পূজিত, জগাই মাধাই উদ্ধার হয়, হরিদাস ঠাকুর কোল পান। “সব মানুষের মধ্যেই ব্রহ্ম আছেন সনাতন ধর্মের এই মহান সত্য” জানিচাই সনাতন সমাজ কাল জয় করিয়া এই সকল দৃষ্টান্ত রাখিয়া দিয়াছে। আর সনাতন সমাজের বিদ্বৎসীরাই আত্ম-প্রতিষ্ঠার লোভে অভিধাপ

দেয়—“অপমানে হতে হবে তাঁদের সমান।” সনাতন-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীকার করেন যে স্বকর্ষ দ্বারা সিদ্ধিলাভকারী ঐ সকলের সমান হওয়া প্রত্যেক মানবের বাঞ্ছনীয়।

(৬) খবরের কাগজে প্রকাশ হইয়াছে, নোয়াখালীর উচ্চবর্ণীয় স্থল মাষ্টার রোগিণী স্ত্রীকে গৃহে না পাওয়াতে পুনরায় বিবাহ করিলেন। মেয়ের তৃতীয় পুস্তকের উপাদান হিসাবে এ ঘটনা ভাল বটে, কিন্তু এ ঘটনার উল্লেখ করিয়া ডাঃ সরকার কি প্রমাণ করিতে চাহেন? কেবল মাত্র সনাতন সমাজেই কি বনিতাঘেষী আছে? সংস্কারী সমাজের কলঙ্ক কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশ না হইলেই কি লুকান থাকে না কি? গত একশত বৎসরের সমাজ-বিদ্বেষীদের প্রত্যেক ঘটনায় যে শাস্ত্রাবমাননার প্রতিফল পদে পদে দেখা গিয়াছে! আর বর্তমানের সনাতনী-দেষ্টা সেই প্রতিফলের প্রতিধাতসম্বৃত এ সকল কথা কি আমরা জানি না? সন্দেহ সন্দেহ ইহাও জানা দরকার যে ঘটনার পর ঘটনা দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে যে হিন্দু বিধবাকে বিবাহ দিয়া বা সম্পত্তি দিয়া কোনও লাভই হয় না, কিন্তু হিন্দু বিধবাকে মর্যাদা দিলে তদপেক্ষা অনেক উপকার তাঁহারও হয়, সমাজেরও হয়। সনাতন সমাজের আদর্শ ইহাই।

(৭) “নানা মুনির নানা মত” আছে, তাহার কারণ “যত মত তত পথ।” সৃষ্টির বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া বিভিন্ন অধিকারীর বিভিন্ন পথে সাধন ধারা নির্ণয় এই হিন্দুর সনাতন সমাজই করিয়াছে, পৃথিবীর অস্ত্র কোনও সমাজ তাহা আজও ধরিতে পারে নাই।

(৮) ডাঃ সরকার বোধ হয় ফ্রেড-মুগ্ধ। বর্তমানের যুবক-সমাজে ফ্রেডের নামে অনেক কথাই চলে তাহা আমরা জানি। ফ্রেডের সহকর্মী Fritz Wittels একজন চিকিৎসক; তিনি ফ্রেডের মত লইয়া অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ফ্রেড একজন কলাকুশলী-একদেশদর্শী অভিনেতা মাত্র। “Freud is an artist, selecting from this or that phase of life whatever pleases him, and is in accord with his own wishes, so that his theories are erected into a gorgeous glittering, and somewhat fantastic wish-fulfilment. Like an artist he transforms diversity into unity by suppressing those manifestations of reality which are to him irrelevant, and he boldly passes beyond proof, labelling as certainty what is merely opinion. Like a propagandist fighting fiercely against sham and insincerity in sexual matters, he cites the positive instances only, that is those facts and cases which suit his perpose.” ফ্রেড নিজের খেয়াল মত জীবনের আংশিক দিক দেখিয়াছেন। তিনি চান তাঁহার কল্পিত মতবাদ একটা প্রকাণ্ড জলুষ-সম্পন্ন ও কতকটা অদ্বৃত রকমে পূর্ণরূপ ধারণ করে। তিনি যাহা অসম্পন্ন মনে করেন সত্যের সেই সমস্ত ঘটনা চাপিয়া একটা একত্র দেখাইতে পটু ছিলেন, আর প্রমাণ অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র মত-প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। যৌন ব্যবহারে কৈতব ও কপটতার ঘোর বিরোধ করিয়া রটনা-কুশলী তিনি নিজের মনগড়া ঘটনাবলীই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ফ্রেডের এই পক্ষপাত দোষের জন্ত বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ হবসন ধরিয়াছেন যে, এই ফ্রেডবাদ lure of the sex itself masquerading as scientific interest—যৌনানুরাগই বৈজ্ঞানিক গবেষণার মুখোশ পরিয়া দেখা দিয়াছে। আমাদের বর্তমানের শাস্ত্রহীন শিক্ষায় শিক্ষিত

সমাজ ভুলিয়া গিয়াছে যে সনাতন ধর্মের আদর্শ শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে বিষয় সম্ভোগ, বার্নিকো মনিবৃত্তি ও যোগে তত্ত্বাগ। বিদ্যাভ্যাসের সময় শিখিনা ব্রহ্মচর্য্য, বিষয় সম্ভোগের উদ্যম সময়ে মানিনা বিধি-নিষেধ, বার্নিকো অহুতির উদ্যম উঠিতে থাকে, যোগের সময় সন্ন্যাস ধর্মো গালি পাড়ি, কেননা তখনও অতৃপ্তকাম পীড়া দেয়। কাজেই মনে হয় ফ্রেড ব্লি কি একটা নূতন বারতা আনিয়াছে। হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্র এই মনস্তত্ত্বকে হজম করিয়া জীবনের অধ্যায়ে অধ্যায়ে জীবন বীণার রাগিনী আশাপের পদ্ধতি শিখাইয়াছেন। ইয়েড বিহোহ করিয়াছিল নিউ টেটামেন্টের কাপট্য ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, আমাদের শাস্ত্রকার যৌবন সম্ভোগের বিষয়ে কোনও কৈতববাদে না কোনও সঙ্কোচে কোনও পথনির্দেশ করিতে হুল করেন নাই, তাই তাহাদের সূর্যালোকের কাছে ফ্রেডের খোঁচোতের ক্ষণিকহাতির কোনই আবহকতা নাই।

এতদ্ব্যতীত বিখ্যাত যৌনতত্ত্ববিদ Schmalhausen ও অভিনেত্রী Beatrice Forbes-Robertson Hale ডাঃ সরকারের উল্লিখিত narcissism সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। গ্রীক দেবতা নার্সিস্ প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাহারই গুণবাচক বিশেষ্য পদ নার্সিসিস্। জীলোকের রূপগর্ভকেই নার্সিসিস্ বলে। পুরুষের পক্ষে egoism অহংসর্ব্ব্বতা যাহা জীলোকের পক্ষে নার্সিসিস্ তাহাই। পুরুষের পক্ষে হ্রোগ করা ব্যাকরণ-দৃষ্ট না হইলেও, ঐ প্রয়োগের একটা সীমা আছে। "The more narcissistic a man is the more completely has the outer world disappeared for him * * * . Megalomania or the mania of magnitude is a particular product of narcissism." ডাঃ সরকার আমার "বাস্তব পরিচয়" পাইয়াছেন narcissism বা দর্পণ-মুগ্ধতা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের উদ্ধৃত বচনে পাই যে দর্পণমুগ্ধতার প্রধান লক্ষণ হইল বহির্জগৎকে ভুলিয়া যাওয়া। "বাস্তব পরিচয়" বহির্জগৎতের বাস্তব না ভুলিবার জন্তই লিখিত। আমার মতবাদকে প্রাধান্য দিবার কোনই চেষ্টা করি নাই, কারণ দ্বিধাস্ব পাঠকের বিচারে ফেলিয়া দিয়াছি। পক্ষান্তরে ডাঃ সরকার এক একটা অপচার ধরিয়া বা ঘটনার অংশমাত্র ধরিয়া বড় বড় উচ্ছাস ও বক্তৃতা করিয়া যে megalomania-র পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে নার্সিসিস্ কোথায় আছে তাহা পাঠকবর্গই বিচার করিতেন। সতীদাহ ব্যাপার লইয়া তিনি আমার লেখার একটা অংশ ধরিয়াছেন, সমগ্রের ধারণার শক্তিও বোঝায় নাই।

(২) আত্মস্মৃতি নিশ্চয়ই নোষের কথা—আত্মপ্রেম নোষের নহে। আমরা কারণ জানি না, ভগবদ্বাকী বিশ্বাস করি, আত্মাই আত্মার একমাত্র বন্ধু। এই আত্মপ্রেমের প্রকৃত স্বরূপ বোধে ও ভারতের সাধনার প্রতি শ্রদ্ধার কারণে বর্তমান লেখক ও তাহার বহু শ্রীযুক্ত চার চন্দ্র মিত্র সীমলার ব্যবস্থাপক সভা সদস্যদিগের কিছু বাস্তব নিবেদন করেন। খ্রীঃ ১৯২০ সালের ৬ষ্ঠ সেপ্টেম্বর তারিখে একজন হিন্দু সাধনায় শ্রদ্ধা সদস্য ঐ সভায় উল্লেখ করেন—বরুণ প্রতি আশীর্বাদী "হুগি দশটা সন্তান দেও ও পতিকে একাদশ রূপে গ্রহণ কর।" এই বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া ফ্রেড-বিলানী শিক্ষিত সদস্য অনেকে উপহাসের টিটকারী দেন। তাহাদের নিকট ফ্রেডের মস্তিস্ক-বিজ্ঞপ্তিত oedipus complex (ইহার বদ্বাদ্যবাদ দিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিব না) একটা বৈজ্ঞানিক সত্য !! আর দশটা পুত্রের জননী হইলে নারী মাত্রই যে বিখণ্ডননী হইয়া যায়, এ সত্য তাহার ধারণায়ই আনিতে পারে না ! ফ্রেড-বিলানীর মস্তিস্ক বৈজ্ঞানিক সমসুতির সন্ধানে নর নারীর যৌন

পাশবিকতার সমূহি খুঁজিয়া তুল্যাধিকারের ভিত্তি পাওয়া গেল বলিয়া আত্ম-প্রতারণা করে, আর ভারতের ঋষি-প্রদর্শিত পথে ভোগের রক্ত কর্দমাক্ত পথ বাহিয়া কি করিয়া নর নারীর আত্মরী ভাব ক্রমে ক্রমে দৈবী ভাবের জয় যাত্রা করে ও সমদর্শনের সর্বোচ্চ সম্মুখে উপনীত করে তাহার সন্ধান রাখাও নিশ্চয়োজ্ঞান মনে করে। আর বিড়ম্বনা এই যে ইহারা ইহা আবার হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থায় নূতন বিধি প্রণয়ন করিয়া সমাজ-সংস্কারক সাজে !!

আসল কথাটা এই যে মহাযুদ্ধের পর মার্কিনে ও ইউরোপে একদল লোক (corruptors of youth) যুব-শক্তিকে উৎসন্ন দিব্যর জ্ঞান লাগিয়াছে। তাহাদের লেগা পড়িয়া আমাদের দেশের ভয়ঙ্করী অন্নবিভাগ কেহই প্রায় তাহা হজম করিতে পারিতেছেন না। ১৩৩৭ সালের ফাস্তন সংখ্যা “ভারতের সাধনা”র মার্কিন দেশের Forum পত্রিকা হইতে দেখাইয়াছিলাম—“আমাদের বর্তমানের দুঃখ কষ্টের স্তূপের জ্ঞান আমরাই দায়ী। চিন্তায় ও ব্যবহারে একটা বিপর্যয় আনিয়াছে আধুনিক যুক্তিবাদী, জড়বাদী ও চরম বুদ্ধিবাদী। ইহারা কেহই গত যুদ্ধে কিছুই কর্ষ ভোগ করে নাই। ইহারা নীতিহীন নীতিবাদী, ছুটো পয়সার জ্ঞান ‘চাল’ বিশারদ এবং সকলেই যুবক-যুবতিকে উৎসন্ন দিব্যর জন্য রটনা-পরায়ণ।” এই সামান্য কথাটা যিনি না বুঝেন, তিনি আত্ম-প্রতারণা করিতেছেন।

ত্রিনরেন্দ্রনাথ শেঠ।

একটি সভার নমুনা

সমাজ সন্মিলন বলিয়া একটু ক্ষুদ্র সভার আয়োজন দেখিবার অবসর আমাদের এবার ঘটয়াছিল। ক্ষুদ্র বলিতেছি এই জ্ঞান যে, বঙ্গের একটা পল্লীগ্রামে উহার জেলার নামে ইহার আস্থান হয়। ক্ষুদ্র হইলেও উহা রহং। কারণ পল্লীগ্রামে যেমন প্রকৃত বিবেকের পরিচয় পাওয়া যায়, সহরে তেমন হয় না। সহরের বৃহৎ সভা সন্নিতিতে আবেগ ও ভাবের খেলা চলে, গ্রামে বাস্তবের সন্ধান মিলে। যে গ্রামে এই সন্মিলনের অধিবেশন হইবার কথা, তাহা বঙ্গবার একখানি বিশিষ্ট স্থান—বিশেষ করিয়া সমাজের দৃষ্টিতে। সমাজের সকল স্তরের লোকই সেখানে আছে। হিন্দু মুসলমানের সম্ভাব বেশ; হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা বা বিদ্বেষ কেহ শুনে নাই—ছুইটি হাই স্থল চলিতেছে তাহাতে সর্বসাধারণ ছাত্রগণ পড়ে; তার মধ্যে আবার ভদ্র পল্লীর মধ্যস্থিত স্থলের বর্তমান সর্ব শ্রেষ্ঠ ছাত্র একটা রজক-পুত্র। পূর্ব বঙ্গের বর্তমান সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস এই স্থানে; প্রবীণ একজন সাহিত্যসেবী এখনও গ্রামের নিভৃত কুটীরে দিবা নিশি সাহিত্য চর্চায় দিনাতিপাত করিতেছেন। আধুনিক চাহুরী-জীবনের প্রতিষ্ঠায়ও এই স্থান উন্নত—জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, প্রদেশীয় ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল, সরকারী সেক্রেটারিয়েট, দপ্তরের রেজিষ্টার, জু-গার্ডেন স্থপারিনটেনডেন্ট, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, অধ্যাপক, স্থলের হেডমাষ্টার, প্রভৃতি অনেক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এই স্থানে রহিয়াছেন। সভার উত্তোক্তা ছিলেন একজন যুবা ‘ব্রহ্মচারী’—হিন্দু মিশনের লোক বলিয়া তাহার পরিচয় ছিল।

গ্রাম্য লোকের আর্থিক দৈন্যই এক্ষণে প্রধান :সঙ্কট—বিশিষ্ট পরিবারগুলি গ্রাম্য সবলেই আপন আপন চিরাগত গ্রাম্য জীবন-প্রণালী তুলিয়া, বাহিরের বাহ্যিক চাকচিক্য মত্ত হইয়া একালের প্রচলিত আইন-কানুন ও আদালতের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট নব-উদ্ভিত কুসীদাজীবি-দিগের হাতে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে; তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ শৃঙ্খলার অর্থসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চাকুরজীবীরা নিজ-উপার্জিত অর্থের ব্যবহারে সমাজের সে স্বাস্থ্য রক্ষা না করিয়া আরও ভাঙ্গিয়াছেন। আজ এদেশের সকল গ্রামের অবস্থা এইরূপ অর্থসাম্য রক্ষা হইলেই সমাজের প্রকৃত রক্ষা হয়, এই নীতি অবলম্বন করিয়া, গ্রামের দুর্দশা দেখিয়া, আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ‘কার্তিকপুর সমবায় লিমিটেড’ নামক একটি যৌথ ধনভাণ্ডার এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। উপস্থিত দেশের যে ধনসম্পদ বুদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক মনে করিয়া এবং বড়দিনের ছুটির সময় উহার বিশেষ এক ব্যবস্থা হইবে এরূপ বন্দোবস্ত থাকায়, ছুটির প্রারম্ভে স্বগ্রামে যে দিন যাই, তার পর দিন সকালে একখানি ব্রহ্মচারী-সাক্ষরিত পত্র পাই যে বন্দরের দিকে ‘হিন্দু সমাজ সম্মিলন সভা’ হইবে; তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাতে যেন উপস্থিত হই। বিকালে সেখানে গিয়া দেখিলাম, এক গোলার ঘরে অনেকে সমবেত হইয়াছেন—অনেকের সহিত সাংগাং হইল যাহাদের নাম শুনিয়াছি কিন্তু জীবনে এ পর্যন্তও দেখা হয় নাই, (গ্রামের সহিত আমাদের এমনই সম্বন্ধ!) এমন একজন শ্রদ্ধাঙ্গদ ব্যক্তিকে এই প্রথম দেখিলাম, তিনি সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে আসিয়া বসিয়াছেন; তাঁহাকে দেখিয়া ও গ্রামের কাজে তিনি আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন ইহা বুঝিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। গতাহুক্রমিক তিন জন ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তথায় উপস্থিত ও তাঁহাদের সঙ্গে নিজ নিজ অনেক লোক আছেন। ব্যবসায়ী শ্রেণীর পল্লীতে সভা বলিয়া তাহাদেরও অনেকে উপস্থিত। স্বাগত কুশল সমাচারাদির পর শুনিলাম, একজন প্রশ্ন তুলিলেন—‘এ সভার উদ্দেশ্য কি আমরা তাহা কিছু জানি না, কে সভা করে তাহা বুঝিতে পারি না।’ সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সমবেত স্বরে তাহার প্রতিধ্বনি করিলেন; কিন্তু প্রকাশ পাইল যে ইতি মধ্যেই সভার নিমন্ত্রণ পত্র সর্বত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছে; গ্রাম হইতে অনেক টাকা তুলিয়াছে, সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন, কলিকাতা হইতে স্বামী প্রভৃতি অনেকে আসিতেছেন, তাঁহাদের যাতায়াতের টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সভাপতির অভিভাষণ ছাপিতে গিয়াছে; ইত্যাদি। গোলমাল আরও বাড়িল। তখন ব্রহ্মচারী তাহার কাগজপত্র লইয়া আসিয়া সভার মধ্যে বসিলেন ও প্রস্তাব করিলেন যে, —তাঁহার কার্যকলাপ বাহা এযাবৎ হইয়াছে তাহা সভা গ্রহণ করিয়া লউন। পূর্ববর্তী আলোচনার পরে এই প্রস্তাবে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া রহিল। সকলক্ষে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন যে,—তবে দেখা গেল যে ঐ সকল বিষয় গৃহীত হইল!! তিন চারি বার এরূপ বলার পরে, আমরা বলিলাম—‘দেখুন ব্রহ্মচারীজি, সভার অবস্থা অতরূপ,—ইহার কোন কিছু জানেন না, অথচ দুই দিন পর আপনার সভাতে বাহির হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিতেছেন। লোকের যেমন ভাব তাহাতে এ সভা হইতে পারে না। সভা যদি করিতে হয়, তবে আপনাকে বলিতেছি শুধুন :—যেমন দেখিতেছি, তাহাতে আপনি ‘হিন্দু-মিশনের, পক্ষ হইতেই এই সভা করিতেছেন, তাহা আপনি স্বীকার করিয়া লউন, আমরা বাহাতে সভা হইতে পারে, তাহার জ্ঞান আপনাকে সাহায্য করিব;.....হিন্দুমিশনের পক্ষ হইতে এরূপ সভা হইলে পারে; সমাজ-সম্মিলনী করিতে হইলে এরূপ স্থানে প্রকৃত সমাজের লোকদিগকে লইয়া সে সম্মিলন করিতে হইবে।’ কিন্তু ব্রহ্মচারী অস্বীকার করিলেন যে, এ হিন্দুমিশনের কার। তখন এত অল্প সময়ে সমাজ-সম্মিলনের কাজ এই স্থানে হইতে পারে না বলিয়া সভার কাজে নিরস্ত

থাকাই সকলের মত হয়। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের দুইজন প্রেসিডেন্ট,—যাহারা আপনাদিগকে স্থানের অভিভাবক বলিয়া মনে করেন—সভা করিয়া দেশের মুখরাথাই আবশ্যক মনে করাতে—অগত্যা এই দুই দিন মধ্যেই, সমাজের পক্ষ হইতেই সভার নূতন ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। নূতন করিয়া তখনই অভ্যর্থনা-সমিতি ও কার্য্যকরী-সমিতি প্রভৃতির গঠন হইল। আমাদের প্রস্তাব—ঐ গ্রামের মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বা প্রবীণ সাহিত্যসেবী ঘটক মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইবেন ও ইউনিয়নবোর্ডের বর্তমান উদ্যোগী প্রেসিডেন্ট সেন মহাশয় তাহার সাধারণ-সম্পাদক হইবেন—প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইল, কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবের বোঝা উঠিয়া আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। আমি যে কাজে দেশে গিয়াছিলাম, বার বার তার দোহাই দিয়াও রেহাই পাইলাম না।

সাধারণতঃ যে ভাবে এ সকল সভাসমিতি হয়, তাহা অনেকটা জানা ছিল। সমাজ-সম্মিলন বলিয়া কলিকাতাতে সর্ব্বপ্রথম যে সভার অধিবেশন হয়, তাহা দেখিয়াছিলাম। প্রথমতঃ সভার বাহ্যিক আড়ম্বরে ব্যয়বাহুল্য হয়, আয় ব্যয়ের হিসাব থাকে না, এবং শেষ পর্য্যন্ত হিসাব কিছু পাওয়া যায় না। পাওনাদার-ঠিকাদার প্রভৃতির বাকী টাকার জন্ম আদালত চলে, পরে তাহাও শোধ না হওয়াতে মূল প্রতীষ্ঠানে ব্যাঘাত পড়ে। তারপর সম্মিলনের মূল উদ্দেশ্য—সমাজের ঐক্য স্থাপন করা, তাহা অর্থ সঞ্চয়ের জন্ম ব্যবস্থিত নানা আড়ম্বর ও আনন্দ-প্রমোদের আয়োজনের মধ্যে ডুবিয়া যায়। পরিণামে ইহাদের কার্য্যকারিতায় মূল উদ্দেশ্য ঐক্য স্থাপনের স্থানে আরও গুরুতর পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। উন্নত ও অল্পন্নত বলিয়া সমাজের যে প্রভেদ কাহারও ধারণাতে আসিত না, সম্মিলনের কল্যাণে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—নূতন দলাদলির সৃষ্টি হয় (১)। আবার যাহারা এই সম্মিলনের জন্ম অগ্রণী হন, তাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও সামাজিক সম্বন্ধে ইহার বিপরীত ভাবই দেখা যায়—যাহারা সমগ্র দেশের সমুদয় জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভেদ তুলিয়া দিয়া দেশের মধ্যে ঐক্যশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তাহারা নিজ ঘরে আপন ভ্রাতার মুখদর্শন করেন না; যে উচ্চবর্ণের নিজ ভ্রাতাও জাতিগণের গলাতে ছুরি বসাইতে সর্ব্বদা উৎসুক, তাহাদের অন্নগ্রহণ করেন না, তিনিই অন্যজনের ভাত ও জল খাইয়া তাহাকে জাতিত্বে বরণ করিতে অগ্রসর; পিতামাতা ও ঘর হইতে যাহারা বিচ্ছিন্ন, সমাজের সম্মিলনে তাহারা ব্যস্ত!

তথাপি ঘটনাচক্রে এই সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিয়া প্রধানতঃ দুইটা বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিলাম—আয় ব্যয়ের হিসাব বা ‘বজেট’টা ঠিক থাকে, এবং স্থানীয় সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোক যোগদান করিতে পারে—বিশেষ করিয়া যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ গ্রামে বাস করেন, তাহারা যাহাতে উপস্থিত থাকেন। আয়ব্যয়ের হিসাব দুই দিন বহু চেষ্টা করিয়াও পাই নাই—বা কাহাকেও লইয়া করিয়া উঠিতে পারি নাই।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে উপস্থিত করিবার পক্ষে যে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলাম, তাহা এরূপ সংশ্লেননসভার সর্ব্বদাই দৃষ্ট আকর্ষণের যোগ্য—ব্রাহ্মণগণ এ সকল সভাতে উপস্থিত হইতে চাহেন না; কারণ তাহারা ইহার রীতিনীতিতে অভ্যস্ত নহেন; বিশেষতঃ এ সকল সভাসমিতিতে তাহাদের প্রতি বিধেয়সূচক আলোচনা ও প্রস্তাবাদি গ্রহণই প্রধানতঃ হয়। সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ ও সংস্কারবাদী গিণনাতির সঙ্গে ইহাই পার্থক্য যে—গিণনাদি লোকের উত্তেজনা ও আবেগ সৃষ্টি

করিয়া একটা কিছু করিয়া লইতে চাহেন, আর সনাতনীর কিছু করিবেন না বা করিতে পারেন না ; কিন্তু এই উভয়ের কার্য্যকরিতার মিল বা ঐক্য স্থাপন না হইলে, প্রকৃত সমাজসম্মিলন হইতে পারে না, ইহাই আমাদের কথা। স্থানীয় ব্রাহ্মণাশ্রমীদের সহিত এই মীমাংসায় আসিতে পারিয়াছিলাম যে,—সম্মিলনী-সভাতে আলোচ্য বিষয়ের বিতর্কিত অংশগুলি কোনও বিচার-সভার সিদ্ধান্ত-সাপেক্ষ থাকিবে—কেবল সভার ভোটের জোরে পাশ করিয়া লইলে চলিবে না। আর কোন ভেদাভেদের ধ্বংসমূলক বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত গঠনমূলক—যেমন সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি—বিষয়ের প্রস্তাব সভাতে করিতে হইবে। এরূপ সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সভাতে উপস্থিত হইতে পারেন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত এই নিদ্রাকরণ করিয়া যখন গভীর রাত্রিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম—তখন দেখিলাম নূতন ব্যবস্থার একটুও কাজ হয় নাই—এবং তাহা হইবার নহে। ইহারা যে ভাবে সভাসমিতি করিতে অভ্যস্ত, তাহা ছাড়া অণু কিছু ইহাতে নাই—তখন ঐ আয়োজন হইতে নিরস্ত হইয়া নব-আরোপিত পদ পরিত্যাগ করিয়া রহিলাম। (দর্শক)

(১) “The present-day Neo-Indian reformers, obsessed by the Western superstition of equality, adopt methods of up-lift which foster dissension and discord where formerly there was good feeling and concord.”—P. N. Bose (Swaraj Cultural and Political).

মাসপঞ্জি—পৌষ, ১৩৩৯

মেদিনীপুরে সমিতি গোরী সৈনিক দলকে অপসারিত করা হইল—গোলটেবিলের তৃতীয় সভার কার্য্য শেষ হইয়া আসিল—এলাহাবাদ ঐক্য সম্মিলন ফল আশাশ্রয় নহে—মহাত্মা গান্ধীর শেষকার্য্য হিন্দুর দেব মন্দিরে অন্ত্যজদিগকে প্রবেশাধিকারের দিকে, সংস্কারকামী রাষ্ট্রপারিষদগণের দ্বারা মাদ্রাজ কোমিশন ও ভারতব্যবস্থাপকসভাতে ঐ বিষয়ে দুইটি বিল উপস্থাপিত করিবার আয়োজন চলিতেছে—দিল্লীর ইকনমিক কনফারেন্সের মতে অটোম্যাটিক ফল ভারতের পক্ষে সন্দেহজনক; আর ইহার মতে অবিলম্বে ভারতে কৃষকবিদ্রোহের আশঙ্কা—বোম্বাই সরকার অর্থক্লান্ততা বশতঃ কতিপয় বিষয়ে ভীষণ ব্যয়সংকল্প করিতে যাইতেছেন—পাটনার রাষ্ট্রনায়ক ও কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ গ্রেপ্তার—নাহোরে ভীষণ বনস্র দেখা দিয়াছে—আইরিশ জননায়ক ডিঃ ভেলেরা প্রকাশ করিয়াছেন যে, “শপথ” সমস্তার তিনি কোনও পরিবর্তন করিতেই নারাজ—ভারতীয় রাষ্ট্রপারিষদের হোম মেম্বর মিঃ ইমার্সন পাঞ্চাবেবের গভর্নর পদ পাইলেন—ইণ্ডিয়া লীগ নামক সভার মতে মহাত্মা গান্ধীকে মুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত, তাহাতে কংগ্রেসের পক্ষে সরকারের রাষ্ট্রসংস্কার কার্য্যে সহযোগের সম্ভাবনা—পাটনার ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলন হইল—চীন জাপান সংঘর্ষে জাতিসম্মত হস্তক্ষেপ করিলে জাপান সম্ভের সংগ্রহ ত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে, বলিতেছে যে—যদি পূর্বদেশে শান্তি চাও ত আমাদের কার্য্যের অনুমোদন কর, আর যদি অশান্তি চাও ত চীনের পক্ষ সমর্থন কর—রুশ সোভিয়েট নেতা টেলীন এফ বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন যে, সোভিয়েটের অস্ত্র শস্ত্র বৃদ্ধির প্রয়োজন, কারণ অচিরে বিশ্বব্যাপী এক সংগ্রামের সম্ভাবনা, তাহাতে দুইটি মাত্র পক্ষ থাকিবে—একটি সোভিয়েটের পক্ষ ও অপরটি সোভিয়েটের বিপক্ষ, তাহাতে সোভিয়েটের দলই প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে—জার্মেনীয় বিভিন্ন রাষ্ট্র পক্ষের সম্মিলনের সম্ভাবনা—সুপ্রসিদ্ধ বাগাড শ বোম্বাই উপকূলে উপস্থিত; তিনি বলিয়াছেন “ভারতই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র বরং উহাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য; খুবই সম্ভব যে ভবিষ্যতে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নত হইবে ও লোকের শিক্ষা বৃদ্ধি পাইবে, তখন ইংলণ্ডকে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াই ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে”—ঢাকায় কামাখ্যা চরণ সেন হত্যার আসামী কালীপদ মুখার্জি ও মেদিনীপুরে ডগলাস হত্যার আসামী প্রচোৎ কুমার ভট্টাচার্য্যের ফাঁদী হইয়া গেল—মিঃ পলক মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ নিমিত্ত ইয়ারাবাদাতে উপস্থিত।

ভারতের সাধনা

প্রসাদন শিল্পে বাঙ্গালীর দান বাঙ্গালীর অর্থে ও বাঙ্গালীর শ্রমে প্রস্তুত বঙ্গলক্ষ্মী মোপ ওয়ার্কসের সাবান

অগুরু

কস্তুরী

প্রীতি

চন্দন

বকুল

বাথ

খসুখসু

রোজ

ইত্যাদি,

সকলই রূপে ও গুণে অতুলনীয়।

অল্প সাবানে বেশী কাপড় কাচিতে—ইহার কাপড় কাচা সাবান যথা—

ডায়মণ্ড, বল ও ওয়াশিং সর্ববশ্রেষ্ঠ।

২৮ নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নূতন প্রকাশিত পুস্তক

শ্রীযুক্ত নলিতমোহন মুখোপাধ্যায়—প্রণীত

কৃষিনিতি ও রূষে আয়ের প্রসার

কেবল কৃষকদিগের জন্ত নহে, অথকার জীবন সংগ্রামের অক্লান্ত পাথারে বেকার-সমস্তায়।

কাতর ভ্রমসন্তান দিগের অভাবনীয় পথ প্রদর্শন।

কার্য্যকরী ও ব্যবহারিক ভাবে সাধারণ মাত্র বৃত্তি এবং মূলধন লইয়া ধান, গম্ ভুট্টা, প্রভৃতি নানা শস্ত, তরিতরকারী ফল, ফুল ও পাতার চাষে কি প্রকারে জীবন সমস্তার সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর সমাধান হইতে পারে—এরূপে আর কখনও দেখান হয় নাই।

সুবহুৎ পুস্তক; মূল্য ২ দুই টাকা মাত্র; প্রথম সংস্করণে অতি অল্প সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইতেছে। যাহারা অগ্রিম টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারা বিনা ভাক খরচে ঘরে বসিয়া পুস্তক পাইবেন।

তেমাথা

নারীপ্রকৃতির গুণ তত্ত্বোৎপাদন—জগতের আধুনিক চিন্তা ধারায় নব আলোকপাত—সত্যের অভিনব রূপ প্রদর্শন।

নরনারীর-সম্বন্ধের বিস্তৃত চিত্র পড়িয়া আর প্রাণমন কলুষিত করিতে হইবে না। নারীতে প্রকৃতির রহস্য দেখিয়া কোতুক, আনন্দ ও বিশ্বাস সকলই চরিতার্থ করিতে পারিবেন। সর্বসাধারণের প্রচারের উদ্দেশ্যে মূল্য মাত্র ১০ চারি আনা—এককালে পাঁচখানি পুস্তক লইলে একখানি পুস্তক বিনামূল্যে পাইবেন।

পাকা ঘুটী

মৌলিক ভাবপ্রসূত তিনটা গল্পের সমন্বয়গ্রন্থ এই চর্কিতচর্কণ গল্প-সাহিত্যের বাজারে যাহারা একঘেয়ে গল্প পড়িয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মুখ বদলাইবার মতন এই পুস্তকখানি একবার পড়িয়া দেখুন। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান।—সুদর্শন পুস্তক ভাণ্ডার।

৮৪নং বেচুচাটা জি. ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গালার নবজাগরণের সমৃদ্ধজন প্রতীক বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

বাঙ্গালী জাতিকে শিম্প-গোরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার
প্রধান নিদর্শন ও পথ প্রদর্শক।

ইহার উৎপন্ন কাপড়

সর্বাপেক্ষা অধিক টেকসই অথচ সুন্দর ও মূল্যবান।

ধুতি, সাড়ী, লংক্লথ, টুইল, ম্যাটিং, ক্রেপ, জামার ছিট, বিছানার চাদর, তোয়ালে
ইত্যাদি যাবতীয় বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে।

স্বাধীন ঔষধালয়, ঢাকা অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এমএ, এফসিএস(লওন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূত পূর্ব অধ্যাপক

নিজ তত্ত্বাবধানে সর্ববিধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিত্তর ভাবে শাস্ত্রমতে প্রস্তুত হয়।
রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে কেটে-
নগ্ পাঠান হয়। কয়েকটি প্রত্যক্ষ ফল প্রদান মহোষধঃ—

১। মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর বিশুদ্ধ ও স্নানপ্রস্তুত) —তোলা
৭ টাকা।

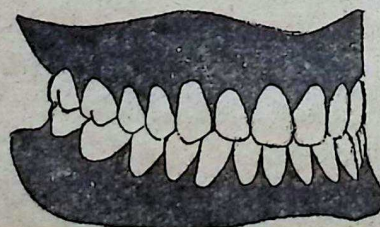
২। বিশুদ্ধ চাবন প্রাশ—সের ৭ টাকা। ইত্যাদি, ইত্যাদি।
ব্রাহ্ম—শ্যামবাজার (ট্রামডিপোর লাগ) ও বহুবাজারের মোড়, কলিকাতা।

দন্ত চিকিৎসার সর্বোত্তম স্থান যোগেশ

ব্রাহ্ম

২নং কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা।

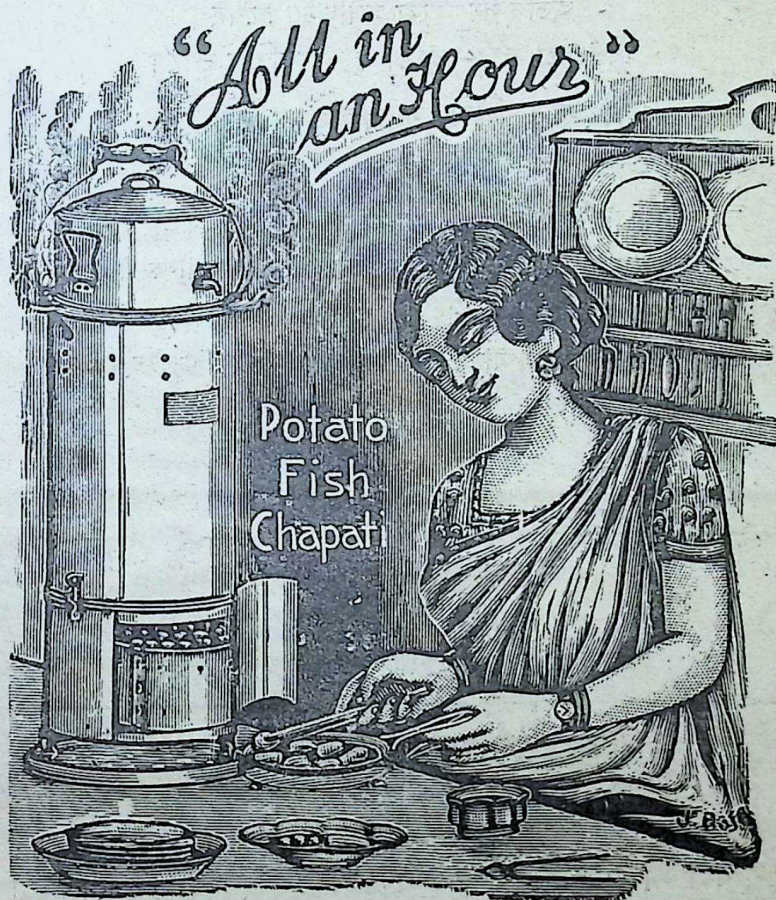


বিনা যন্ত্রণায় দাঁত তোলা—
কৃষ্ণ দাঁতের সকল প্রকার
চিকিৎসা—প্লেটফ্রাক ও প্লেট
বিনা কৃত্রিম দন্ত নির্মাণ
ইত্যাদি অতি উচ্চ শ্রেণীর
কার্য্য সদত মূল্যে করা
হয়।

Dr. I. M. Mallick's (M.A., M.D., B.L.)

Patent

ICMIC COOKER.



CHAPATI-MAKING & FRYING ARRANGEMENT

Simultaneously with Cooking and Baking

HAS REMOVED A LONG-FELT WANT

এক সঙ্গে এক ঘটায় পাঁচ রকমের খাদ্য অল্প খরচে, বিনা পরিশ্রম রন্ধন করা যায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে রন্ধন হয় বলিয়া স্নাতকের পক্ষে বিশেষ উপকারী

বিজ্ঞাপন

মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

অত্যন্ত সময় মধ্যে অসাধারণ রূপেই
বিশ্বস্ততা কর্ম-দক্ষতা ও স্বাদেশিক ভাবে
লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে।

ডিরেক্টরগণ—

শ্রীর নীলরতন সরকার কে-টি, এম-এ এম-ডি, ডি-সি-এল এম-এল-সি।

শ্রীর হরিশঙ্কর পাল, কে-টি, বি, কে, পাল এণ্ড কোং স্বাধিকারী।

শ্রীযুক্ত জে. এন. বসু এম-এ-বি এল, এম-এল-সি, সলিসিটর।

রায় সত্যশচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর, বঙ্গলক্ষী কটন মিলস্ লিমিটেড।

শ্রীযুক্ত এস, ভট্টাচার্য্য, বঙ্গলক্ষী কটন মিলস্ লিমিটেড।

ম্যানেজিং এজেন্টস

ভট্টাচার্য্য চৌধুরী এণ্ড কোং

হেডঅফিস

২৮নং পোলক ষ্ট্রীট কলিকাতা

হিন্দু বুকবাইন্ডিং

কেবল মাত্র ভদ্র হিন্দু কারিগর দ্বারা পরিচালিত।

সকল প্রকার পুস্তক জাবোদা, খতীয়ান, লেজার, ডে বই, জার্নাল প্রভৃতি
খাতা, চেক, দাখিলা, ক্যামেমো, ও অগাথ সকল প্রকার বান্ধাইয়ের কার্য সুচারু-
রূপে সম্বর সম্পন্ন হয়।

কুমার আদাস

৭৯২সি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

এখন কম খরচে পারিবারিক সামান্য রোগ সারে।

জয়ন্তী

সন্দিঘর ও ইনফ্লুয়েন্সায়
বিশেষ উপকারী। এক
কোটা ১০ আনা।

মুভেদী

সহজে কোষ্ঠ পরিষ্কার
করে। এক কোটা
৯০ আনা।

কণকা

ক্রিমিরোগের মহৌষধ।
এক কোটা ১০ আনা।

দাঁদরি

দাঁদ সমূলে ছুর করে।
ব্যবহারে ঝালা যন্ত্রণা
নাই। কাগড়ে দাগ
লাগে না। এক কোটা
৯০ আনা।

চৌপিকা

এই বটিকা সেবনে চোয়া
ঢেঁকুর উঠা, পেট ফাঁপা
বুকজ্বালা ও অনীর্ণিত
দূর হয়। এক কোটা
৯০ আনা।

সকল সম্ভ্রান্ত ডাক্তানখানায়—
বা নীচের ঠিকানায় পাওয়া যায়।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২২, কলুটোলা, কলিকাতা।



নবমুগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র

চিকিৎসা

আয়ুর্বেদ প্রচারে অত্রদ্রষ্ট

সি, কে, সেন এণ্ড কোং পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনার একদিক উজ্জ্বল করিয়াছে।

জগতের বাবতীয় চিকিৎসা গ্রন্থের মূল ভিত্তি স্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্বেদ-দীপিকা' ও মহামহো-
পাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্ল-কল্পতরু' নামী
চীকাম্বর সংহিতা

উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সজ্জিত

মূল্য প্রথম খণ্ডে সমগ্র স্বত্বস্থান—৭১০, ডাকমাণ্ডল ১ মাত্র

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান শারীর ও ইন্দ্রিয়স্থান—মূল্য ৬১০, ডাকমাণ্ডল—৬/০

আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

চিকিৎসক ও গৃহস্থের তুল্যরূপ প্রয়োজনীয়। এরূপ সুবৃহৎ ও অত্যাশ্চর্য
গ্রন্থ এতাবৎকাল প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য—১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড একত্র ৭১০ ;
ডাঃ মাণ্ডল ৬০/০, তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট পৃথক ১ ; ডাঃ ১/০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, কলিকাতা।

য্যান্টি-থার্মোলিন

নিউমোনিয়া

প্লুরিসি, ব্রঙ্কাইটিস্ ও অন্যান্য ফুলায়

একান্ত ব্যবহার্য্য।

বটকর পাল এণ্ড কোং

কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রাগিষ্টস্

১নং, স্মফিল্ড লেন,

কলিকাতা